চাষার মেয়ে

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

এম সি সরকার এণ্ড সন্স

৯০।২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

আষাঢ় ১৩৩১

দাম পাঁচ সিকা

প্রকাশক

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

এম সি সরকার এণ্ড সন্স

৯০।২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

করকমলে——

চাষার মেয়ে

আমি চাষার মেয়ে, আমার বাবা চাষ করত, আমরা জাতে চাষী-কৈবর্ত্ত। বাবার কথা আমার বেশী মনে নেই। শুধু স্বপ্নের মত মনে পড়ে, কালো নুয়ে-পড়া একখানা জীর্ণ দেহ আমায় কোলে কোরে নিয়ে যেত খেয়া-ঘাটের ধারে সে একটা ময়রার দোকানে, সেখানে আমার হাতে খানকয়েক বাতাসা দিয়ে বাবা বসে তামাক খেত। সে খেয়া-ঘাট নেই খাল মজে গেছে, সে ময়রা নেই, আমার বাবাও নেই। আর মনে পড়ে, বাবা আমায় মাঝে-মাঝে আমাদের গ্রাম থেকে মাইল দুয়েক

দূরে যে প্রকাণ্ড জলা আছে সেই জলার ধারে নিয়ে যেত। অনেকখানি রাস্তা, চল্‌তে আমার কষ্ট হোতো বলে বাবা আমায় মাঝে-মাঝে কোলে তুলে নিত। বাবার দেহের হাড়গুলো আমার শরীরে ফুট্‌ত আর লাগ্‌ত। আর মনে পড়ে, একদিন ভোরবেলার কথা,—তখন একটু-একটু শীত পড়েছে, আমি একখানা কাঁথা গায়ে দিয়ে মার পাশে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, কোথা দিয়ে যে রাত কেটে গিয়েছে জানি না, হঠাৎ আমার মা পাড়া কাঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল—ওগো আমার কি সর্ব্বনাশ হোলো গো!

মার চীৎকার শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখ্‌লুম বাবা শুয়ে রয়েছে আর মা তার পাশে বসে চেঁচিয়ে কাঁদ্‌ছে আর মাথা খুঁড়্‌ছে। খানিকক্ষণ হতভম্বের মত থেকে মাকে জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে মা, অত চেঁচাচ্ছিস্‌ কেন?

মা সেই রকম চেঁচাতে-চেঁচাতেই বল্লে—ওরে সর্ব্বনাশী আর কাকে বাবা বলে ডাক্‌বি?

সর্ব্বনাশ যে কি হোলো তা বোঝবার আগেই আমিও মার সঙ্গে চীৎকার করতে লাগলুম।

বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে পাড়ার লোকেরা আমাদের বাড়ীতে এসে জমা হোতে লাগ্‌ল। বাড়ীর বাইরে বসে জনকয়েক লোক মিলে বাঁশের একটা খাট তৈরি কোরে আমার বাবাকে ঘরের ভেতর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তার ওপরে শুইয়ে দিলে। তারপর হরিবোল দিতে-দিতে শ্মশানে নিয়ে

গেল। মার আঁচল ধরে আমি যেমন কোরে পুকুরে নাইতে যেতুম, তেমনি কোরে শ্মশানে গেলুম। প্রায় সন্ধ্যে:বলা বাবার দেহ পুড়িয়ে আমরা কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ী ফিরে এলুম। এ সব কথা আজ স্বপ্নের মত মনে পড়ে। এক-একবার মনে হয় এ বুঝি আমার জীবনের কথা নয়।

বাবা মারা যাবার আগেই আমার বিয়ে হোয়ে গিয়েছিল। বিয়ের কথা আমার কিছু মনে নেই, শুনেছি যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন নাকি আমার তিন বছর বয়েস। আমার শ্বশুরবাড়ী আমাদের গাঁ থেকে সাত আট মাইল দূরে। আমার শ্বশুর বেশ অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। ব্যবসার খাতিরে তাঁকে আমাদের গাঁয়ে মাঝে-মাঝে আস্‌তে হোতো। একবার আমাকে দেখে তাঁর পছন্দ হওয়ায় তিনি বাবার কাছে আমাকে পুত্রবধূ করবার প্রস্তাব করেন। আমাদের জাতে খুব ছেলেবেলাতেই বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ থাকলেও বাবা তাঁর একমাত্র শিশুকন্যার বিয়ে দিতে তখন রাজী হন-নি। কিন্তু আমার শ্বশুর কথা দিয়েছিলেন যে, বউ বড় না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি তাকে বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য জেদাজেদি করবেন না। তার ওপর আমার মূল্যস্বরূপ মোটা কিছু দক্ষিণাও দিতে চাওয়ায় আমার বাবা তাঁর কথায় রাজী হোয়ে ধনী নফর দাসের একমাত্র শিশুপুত্রের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিলে।

আমার বাবা মারা যাওয়াতে আমাদের চাষ ও কাজ-কর্ম্ম সব বন্ধ হোয়ে গেল। আমাদের সংসারে ব্যাটা-ছেলে আর

কেউ ছিল না। বাবা নিজের হাতে চাষ করত, মাঝে-মাঝে জন নিয়েও কাজে লাগাতো, কিন্তু বাবা মারা যাওয়াতে সে সব কাজ আর কে করবে! তবে আমার মা ছিল ভারি বুদ্ধিমতী মেয়েমানুষ। মা নিজে চেষ্টা কোরে আমাদের জমিগুলো ভাগে দিলে। আমাদের দু-জোড়া হেলে-গরু ছিল—মা সেগুলোকে ভাড়া খাটাবার বন্দোবস্ত কোরে দিলে। বাড়ীতে গাই ছিল, তার দুধ বিক্রি হোতো। আমার শ্বশুরের দেওয়া কিছু টাকা ছিল, তারও কিছু-কিছু সুদ আস্‌ত, আমাদের মা বেটীর খাওয়া-পরার কোনো কষ্টই ছিল না।

একটু সেয়ানা হতেই জানতে পারলুম যে, আমার বিয়ে হোয়ে গেছে, সেই সঙ্গে-সঙ্গে আর একটা মারাত্মক কথাও শুনলুম, যে বড় হোলেই আমায় মাকে ছেড়ে শ্বশুর-ঘর করতে যেতে হবে। আমার শ্বশুর ন-মাস ছ-মাস অন্তর এক-একদিন আমাদের বাড়ীতে আমাকে আর মাকে দেখতে আস্‌তেন। শ্বশুর বাড়ীতে এলেই আমার সমস্ত স্বাধীনতা লুপ্ত হোতো। আমার ঐটুকু দেহে মা একখানা দশহাত শাড়ী জড়িয়ে দিতেন, চেঁচাবার যো নেই, ছোটবার যো নেই, সমবয়সী ছেলেমেয়ে বা খেলার সঙ্গীরা এলে তাদের সঙ্গে খেলবার বা বাড়ী থেকে বেরোবার উপায় নেই; শ্বশুর এলেই গুঁড়িসুড়ি মেরে একটা গড় কোরে তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে বস্‌তে হোতো। তিনি মার সঙ্গে গল্প করতেন; সে সব সাংসারিক কথা, তার অধিকাংশই আমি বুঝতে পারতুম না, কিন্তু তা হোলে কি হয়, আমায়

সেখানে সর্ব্বক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে হোতো। আমি ভাবতুম, শ্বশুর যদি এমন, শ্বশুরবাড়ী না জানি কি সাংঘাতিক জায়গা!

আমি আমার সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গেও মিশতুম। তাদের সঙ্গে ডাণ্ডা-গুলি খেলা, ঘর কেটে চির্কলে খেলা, সব তাতেই যোগ দিতুম। শুধু আমিই যে ছেলেদের সঙ্গে খেলতুম তা নয়, আমাদের গাঁয়ের অনেক মেয়েই খেলত। এমনি কোরে আমার ছেলেবেলাটা কাটতে লাগল। ক্রমে আমার দু-তিন জন সঙ্গিনীর ভিন্-গাঁয়ে বিয়ে হোয়ে গেল। তারা আমাদের সাধের খেলাঘর ছেড়ে কাঁদতে-কাঁদতে শ্বশুর-ঘর করতে চলে গেল। যখন ফিরে এল, কারো মাথার আধখানা সিঁদুরে জোবড়ান, কারো বা মাথার সিঁদুর একেবারে মুছে গেছে। সঙ্গীরা বড় হোয়ে ক্ষেত-খামারের কাজে লাগতে লাগল, দিনান্তেও তাদের একবার দেখা পাওয়া ভার—এমনি কোরে আমাদের খেলাঘর ভাঙতে লাগল।

আমার বন্ধুরা সবাই কাজে ব্যস্ত। আমারই শুধু কোনো কাজ নেই! ঘরের যা কিছু কাজকর্ম্ম সে করতে কতক্ষণ সময়ই বা কাটে? সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সময় সবাই কাজের দমে কলের পুতুলের মত ঘুরতে থাকে, আর এই কর্ম্মময় জগতে আমারই শুধু বিপুল অবসর। দুপুরবেলা মা যখন ঘুমোত, শব্দহীন গম্ভীর দুপুরের বুকে কাঠ-ঠোক্রা অনবরত একই পর্দ্দায় ঘা মেরে-মেরে আমার বুকে কি-এক অজানা করুণ রাগিনী

জাগিয়ে তুলত। বুঝতে পারতুম না কিসের সে ব্যথা, বোঝবার চেষ্টাও করতুম না। সেই নিরালা দ্বিপ্রহরে কতদিন বসে-বসে কেঁদেছি, কেন কেঁদেছি তাও জানি না।

মাঝে-মাঝে আমার মনে হোতো সময় ক্রমেই এগিয়ে আসছে। সেদিন শ্বশুর এসে মাকে বলে গিয়েছেন—এবার বৌমা বড়-সড়টি হোলো, এবার ওকে নিয়ে যাই। মাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে! মনে হোতো সে আমি পারব না, শ্বশুর-ঘর করতে আমি পারব না। তার চেয়ে একলা এখানে বসে-বসে কাঁদা, এই ভাল, সেখানকার চেয়ে এই ভাল।

একদিন সকালবেলা মা দুঃখু কোরে বল্লে—এমন কপাল আমার; ভগবান একটা দিলে তাও মেয়ে, ছেলে থাকলে কি লোকে আমায় এমনি কোরে ঠকাতে পারে?

মাকে জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে মা?

মা বল্লে—আর হবে কি, সনাতন দাস আমার সর্ব্বনাশ করলে? ক্ষেতে যা কিছু হয় নিজে তার সর্ব্বস্ব খেয়ে আমায় বলে এবার কিছু হোলো না, কে-ই বা দেখে!

সনাতন দাসের বাড়ী আমাদের বাড়ীর কাছেই। আমাদের খানিকটা জমি তাদের ভাগে দেওয়া হয়েছিল। মার কথা শুনে আমি মনে করলুম, এবার থেকে দুপুরবেলা ঘরে বসে না থেকে আমি রোজ মাঠে যাব, মার ছেলে নেই, আমি যতটা পারি তার সে দুঃখ ঘুচিয়ে দেব। সনাতনদের যে জমিটা ভাগে দেওয়া হয়েছিল, সে জমিটা আমাদের বাড়ী থেকে

বেশী দূরেও নয়। অবিশ্যি এ সব কথা মার কাছে তখন প্রকাশ করি-নি।

সে সময় কিসের চাষ হচ্ছিল মনে নেই। সনাতনের ছেলে সুদামও তার বাপের সঙ্গে কাজ করতে যেত। সনাতনের পরিবার দুপুরবেলা তাদের জন্য ভাত নিয়ে যেত। আমি সনাতনের পরিবারের সঙ্গে দুপুরবেলা মাঠে যেতে আরম্ভ করলুম। এজন্য মা আমায় কিছু বলত না। কেউ কিছু বল্লে, মা বলত, আরও তো চলল; কদিনই বা ও-রকম কোরে বেড়াবে, যে-ক-দিন পারে কোরে নিক্। সুদাম ছিল আমার খেলার সঙ্গী; দুপুরবেলা তারা কাজ কবত, আমি তাদের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতুম। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে তারা মাঠ থেকে ফিরে আসত, আমিও সুদামের সঙ্গে গল্প করতে-করতে বাড়ী ফিরতুম।

প্রায় মাস দুয়েক এই রকম কোরে কাটল। একঘেয়ে জীবনের মধ্যে এই বৈচিত্র্যটুকু বেশ লাগছিল, এমন সময় আর একটা বৈচিত্র এসে আমার জীবন একটা ব্যথাভরা সুখে ভরিয়ে দিলে।

কয়েকদিন উপরি-উপরি ক্ষেতে যাওয়ার পরই রোজ সেখানে যাওয়াটা যেন আমার নেশার মত হোয়ে দাঁড়াল। বেলা দুপুর বাজলেই আমার মন চন্‌মন্ কোরে উঠত, মাঠের মধ্যে থেকে যেন ডাক আসত—কৈ! আজকে আসবি-নে বুঝি?

কাজ থাকলেও আমি সে সব ফেলে পালাতুম, থাকতে পারতুম না।

এই নিয়ে মা আমায় যে কত গালাগালি দিত তার ঠিক-ঠিকানা নেই, কিন্তু মাঠে যাওয়ার নেশা আমাকে ভূতের মতন চেপে ধরলে। ইদানীং সুদামের মার জন্য আর আমি বসে থাকতুম না, একাই চলে যেতুম, বাড়ী ফিরতুম আমি আর সুদাম। সে গল্প করত আর বাঁশি বাজাত—তাই শুনতে-শুনতে বাড়ী ফিরে আসতুম।

একদিন, সেদিন সুদামের বাপ ও অন্য-অন্য লোকেরা একটু বেলা থাকতেই বাড়ী ফিরেছিল। সেদিন সুদামের কাজ আর শেষই হয় না, অনেক তাড়া দেওয়ার পর সে বল্লে—আমি এখন যাব না, তুই যা।

আমি বল্লুম—আমি এই সন্ধ্যেবেলা একা যাই কি কোরে? তুই আগে বল্লি-নে কেন, ওদের সঙ্গে চলে যেতুম।

সুদাম আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে পুকুরে মুখ ধুতে চলে গেল। সেখানে হাত-পা-মুখ ধুয়ে গাছের ওপরে তার নির্দ্দিষ্ট জায়গা থেকে বাঁশিটা পেড়ে নিয়ে আমায় বল্লে—চল্।

সেদিন আর তার মুখে কোনো কথা নেই, একমনে সে বাঁশিই বাজিয়ে চলেছে। আমারও কেন সেদিন আর কথাবার্ত্তা ভাল লাগছিল না। সেদিন তার বাঁশির সুর আমার এত মিষ্টি লাগছিল যে, এর আগে আর কখনো এমন লাগে-নি।

সরু পথ, পাশাপাশি দু-জন চল্‌বার উপায় নেই। দু-পাশে

ঘন কাঁটার জঙ্গল, তার মধ্যে দিয়ে সুদাম বাঁশি বাজিয়ে চলেছে আমি ঠিক তার পিছনে চলেছি। হঠাৎ পথের বাঁকে সে বাঁশি থামিয়ে দাঁড়াল। আমি এগিয়ে আসতে সে বল্লে—হ্যাঁরে সৌরভ, তুই শ্বশুরবাড়ী যাবি ?

আমি বল্লুম—ধেৎ, আমি সেখানে যাব না।

সুদাম আরও খানিকটা পথ এগিয়ে বল্লে—তোকে নিতে এলে তুই কি করবি ?

— তাদের বলে দেব—যাব না, পালিয়ে থাকব।

সুদাম বল্লে—আমাদের বাড়ীতে এসে লুকিয়ে থাকিস্।

আমি কোনো কথা বলবার আগেই সে বাঁশিটা মুখে তুলে নিয়ে আবার বাজাতে-বাজাতে এগিয়ে চল্ল।

শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা আমায় নিতে এলে আমি যে কি করব সেই ভাবনায় আমি দিনে-রেতে স্বস্তি পাচ্ছিলুম না। সুদাম আমায় তাদের বাড়ীতে লুকিয়ে থাকতে বলায় বুকের মধ্যে থেকে যেন একটা মস্ত-বড় বোঝা নেমে গেল। সুদাম চলতে চলতে আবার বাঁশি থামিয়ে বল্লে—জানিস সৈরি, আমি বিয়ে করব না।

—কেন রে ?

—না।

—কেন ? তোকে তো আর বিয়ে করলে ভিন্-গাঁয়ে যেতে হবে না।

সুদাম একটু পরে বল্লে—না রে, সে জন্যে না। আমি একজনকে

ভালবাসি, তাকে বিয়ে না করতে পারলে আমি বিয়ে করব না।

সুদাম কাকে ভালবাসে তা জানবার জন্য আমার মনটা ছট্‌ফট্‌ করতে লাগ্‌ল, কিন্তু তখুনি তাকে সে কথাটা জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না। সে আবার বাঁশি বাজিয়ে এগিয়ে চল্‌ল। আমার মনের কৌতুহলটা কিন্তু আর বেশীক্ষণ চেপে রাখতে পারলুম না। দু-পা চল্‌তে না চল্‌তেই জিজ্ঞাসা কোরে ফেল্লুম—সুদাম কাকে ভালবাসিস্‌ আমায় বল্‌বি-নে?

—বল্‌ব, কিন্তু কাউকে বল্‌বিনে বল!

—না।

—না তুই বলে দিবি। এই কথা বলে আবার সে বাঁশি মুখে তুলে নিলে। আমি তার হাতখানা টেনে মুখ থেকে নামিয়ে দিয়ে বল্লুম—বল্লি-নে!

সুদাম বল্লে—দিব্যি কর কাউকে বল্‌বি-নে।

—তোর দিব্যি বল্‌চি।

এবার সুদাম একটু গম্ভীর হোয়ে পড়্‌ল। আমার যেন আর দেরী সইছিল না। আমি অত্যন্ত অসহিষ্ণু হোয়ে তাকে বল্লুম—এই বেলা বল্‌, বাড়ীতে এসে পড়লুম যে।

সুদাম বল্লে—মেরি আমি তোকে ভালবাসি, তুই শ্বশুর বাড়ী চলে গেলে আমি দেশ ছেড়ে চলে যাব, তোকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব না।

সুদামের কথা শুনে আমার পা-দুটো থর্‌ থর্‌ কোরে কাঁপ্‌তে

লাগল। আমি আর দাঁড়াতে পারলুম না, তাকে ধরে বসে পড়লুম। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই আমার চোখ দিয়ে হু-হু কোরে জল ঝরতে আরম্ভ করলে। কেন যে সে কান্না তাও বুঝতে পারলুম না। স্থদাম আমায় তুলে নিয়ে আমাদের বাড়ীর দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে চলে গেল, আর একটি কথাও বল্লে না।

জীবনের মধ্যে এবার যে বৈচিত্র্য এল তার আস্বাদন কি মধুর! সুদামের প্রেমের কথাগুলো আমার কানে যেন মধু বর্ষণ করত। সে কখনো ভাষায় কখনো সুরে আমায় যে সব কথা বলত তার সমস্ত কথা আমি বুঝতেই পারতুম না, তবুও আমার মনে হোতো সে আমায় ভালবাসে। সন্ধ্যার সময় আমরা দুজনে গল্প করতে-করতে যখন বাড়ী ফিরতুম তখন মনে হোতো পথের যদি শেষ না থাকত, এমনি কোরে তার কথা শুনতে-শুনতে যদি আজীবন পথ চলতে হোতো তো বেশ হোতো। ভালবাসা

এমনি জিনিষই বটে! আমিও সুদামকে ভালবাসতুম—প্রাণ ভরে ভালবাসতুম, কিন্তু আমার মুখে কথা জোগাত না। সেও ছিল চাষার ছেলে, কিন্তু এত কথা সে কোথা থেকে শিখেছিল জানি না। আমার মনে হোতো আমিও তাকে কিছু বলি, হয়তো সে মনে করছে, আমি তাকে ভালবাসি না, কিন্তু কথা জোগাত না, তার ভালবাসার গর্ব্বেই আমার বুক ফুলে উঠত।

একদিন মা আমায় বল্লে—দিনরাত সনাতনের ছেলেটার সঙ্গে ঘুরে মর কেন? এখন কি ব্যাটা-ছেলের সঙ্গে ধেই-ধেই কোরে নেচে বেড়াবার বয়স আছে?

মার কথার কোনো জবাব দিলুম না, জবাব দেবার কি আছে! চুপ কোরে এটা-ওটা জিনিষপত্র নাড়াচাড়া করতে লাগ্‌লুম।

আর একদিন মা বল্লে—হাড়হাবাতী তোর নিন্দেয় যে আর কান পাতা যায় না। ফের্ যদি ঐ সুদাম ছোঁড়াটার সঙ্গে তোকে দেখি, তা হোলে হাড়মাস আলাদা কোরে ছাড়্‌ব।

সেদিন আর আমি চুপ কোরে থাকৃতে পারলুম না! মাকে বল্লুম—কে তোমায় কি বলেছে শুনি? বেশ করব আমি ওর সঙ্গে বেড়াব। আমি গাঁয়ের কারো সঙ্গে এক চালায় বাস করি-নে, কারুর খাইও-নে।

আমার মুখে এই রকম চোপা শুনে মা চুলের ঝুঁটি ধরে গুম্ গুম্ কোরে কতকগুলো কিল মারলে। মার খেয়ে আমি

রেগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে সেই জলার ধারে চলে গিয়ে সেখানে বসে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লুম।

সেদিন আর সমস্ত দিন বাড়ী ফিরলুম না। এক-একবার মনে হচ্ছিল যে, পায়ে কাপড়খানা বেঁধে জলার মধ্যে লাফিয়ে পড়ি, কিন্তু তা পারলুম না। সুদাম! সুদাম! তাকে ছেড়ে একলা কি কোরে মর্‌ব।

সমস্ত দিন, সেই সকাল থেকে প্রায় সন্ধ্যে অবধি—না খেয়ে না নেয়ে আমি সেই নির্জ্জন জলার ধারে বসে রইলুম। কিন্তু আমাদের সেই বাড়ী ফেরবার সময় আর বসে থাক্‌তে পারলুম না। মনে হোলো এবার যাই, সুদামকে মাঠ থেকে ডেকে নিয়ে বাড়ী যাই। জলা থেকে বাড়ী ফেরবার পথেই সুদামদের ক্ষেত; তখন সে রোজ ক্ষেতে আস্‌ত, কি একটা বোনা হচ্ছিল। আমি জলা থেকে ফেরবার পথে মাঠের ধারে উঁচু রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখলুম, ক্ষেতে অনেকে কাজ করছে, কিন্তু সুদামকে দেখতে পেলুম না। সে সেখানেই আছে মনে কোরে আমি ক্ষেতে নেমে গেলুম, কিন্তু তার দেখা পেলুম না, বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলুম।

বাড়ীতে ফিরে দেখি সেখানে অনেক লোক জড় হয়েছে। মা আমাকে দেখে চীৎকার কোরে কেঁদে উঠ্‌ল—সর্ব্বনাশী কোথায় গিয়েছিলি?

আমি মার কথার জবাব না দিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

মা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ঘরের মধ্যে এসে বল্লে—ধন্যি মেয়ে বাবা, আমার ঘাট হয়েছিল তোমাকে মেরেছিলুম। বাড়ী যে ফিরেছ এই আমার বাবার ভাগ্যি!

আমি মার কথার কোনো জবাব না দিয়ে পড়ে রইলুম। মা আবার জিজ্ঞেস করলে—কোথায় ছিলি সমস্ত দিন।

—জলার ধারে বসে ছিলুম।

—ও বাবা এই রদ্দুর! জানোয়ারে সইতে পারে না, আর তুই সেখানে সারাদিন বসে রইলি? মরবে যখন, তখন আমি দেখতে পারব না।

—কে তোকে দেখতে ডেকেচে, তুই যা না।

মা আর আমার কথার কোনো জবাব দিলে না। কিছুক্ষণ পরে বল্লে—গাঁ শুদ্ধ লোকে তোকে খুঁজে সারা। সুদাম সেই যে বেরিয়েছে এখনো ফেরে-নি।

মা আমায় তুলে নিয়ে গেল। আমার শরীর একেবারে এলে এসেছিল, গরীবের মেয়ে হোলেও আমি সুখে-স্বচ্ছন্দেই মানুষ হয়েছি—অতক্ষণ না খেয়ে থাকা আমার কোনো কালেই অভ্যেস ছিল না। আমি সেই সন্ধ্যেবেলা স্নান কোরে খেয়ে শুয়ে পড়লুম।

শুয়েই মনে হোলো, সুদামের কথা। সে আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে এখনো ফেরে-নি। আহা! তারও তো নাওয়া-খাওয়া কিছুই হয়-নি। না জানি রোদে ঘুরে-ঘুরে তার কত কষ্টই হয়েছে, একবার ইচ্ছে হোলো তার বাড়ীতে খোঁজ কোরে আসি।

এই তো তাদের বাড়ী, এখান থেকে দু-পা বৈতো নয়। উঠ্‌বার চেষ্টা করলুম, কিন্তু উঠ্‌তে পারলুম না। তারই কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলুম, আমি বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছি। এমন জায়গায় গিয়েছি যে, সেখানে জনপ্রাণী নেই, দূর থেকে সুদামের বাঁশির সুর বাতাসে ভেসে এসে আমার কানে লাগ্‌ছে। বাঁশি খালি বল্‌ছে—কোথায় তুই? আর কত দূরে! বাঁশির সুর লক্ষ্য কোরে যেদিকে যাই অমনি মনে হয় তার বিপরীত দিক থেকে শব্দ আস্‌ছে, আবার উল্টো দিকে ছুটি—এমনি কোরে চারিদিকে ছুটোছুটি কোরে মর্‌ছি, কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল, তখন অনেক রাত। ঝিঁঝির গাজন তখন খুব জমে উঠেছে, তারই ভেতর থেকে অতি ক্ষীণ বাঁশির সুর আমার কানে বাজতে লাগ্‌ল। বাঁশির আওয়াজ শুনেই মনে হোলো—এ সুদামের বাঁশি! একটা আস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম—যাক্, ফিরে এসেছে। বাঁশির আওয়াজ ক্রমে স্পষ্টতর হোতে-হোতে একেবারে আমাদের বাড়ীর ধার দিয়ে চলে গেল। বুঝলুম, সুদাম এতক্ষণে বাড়ী ফির্‌ল। তখন বোধহয় রাত দেড়প্রহর উৎরে গিয়েছে।

পরের দিনের সকালটা যেন দিনের বুকে অসাড় হোয়ে পড়ে রইল, কিছুতেই আর সে যেতে চায় না। আমার মনটা ছট্‌ফট্ কর্‌ছিল, কতক্ষণে বেলা হবে, মাঠে গিয়ে সুদামের সঙ্গে দেখা

করব। কোনো রকমে দুপুর অবধি ঘরে কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। মাঠে গিয়ে দেখলুম, সুদাম খেয়ে-দেয়ে গাছের তলায় বসে জিরোচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়েই সে জিজ্ঞাসা করলে—কাল আমার বাঁশি শুনেছিলি?

আমি বল্লুম—হ্যাঁ, কিন্তু তোর ফিরতে অত রাত হোলো যে! কোথায় গিয়েছিলি?

—সে কোথায়, কোথায়, অনেক দূর—

আমি বল্লুম—আর কখনো আমি না বলে কোথাও যাবি না। কাল তোর বড় কষ্ট হয়েছে, আমার ওপর রাগ করিস-নি ভাই।

সুদাম বল্লে—কষ্ট! না না কষ্ট আমার কিচ্ছু হয়-নি, কাল্‌কের দিনটা আমার বড় সুখে কেটেছে!

সুদামের কথাগুলো ধাঁ কোরে আমার বুকে একটা আঘাত দিয়ে চলে গেল। বোধহয় আমার চোখের কোনে একটু জলও দেখা দিয়েছিল। কষ্ট হয়-নি তা হোলে! আমার জন্য তার কিছুমাত্র কষ্ট হয়-নি! কাল সারাদিন আমার সঙ্গে তার দেখা হয়-নি—তার দিন সুখেই কেটেছে!

সুদাম বল্লে—তোর মা যখন আমাদের বাড়ীতে গিয়ে বল্লে, তুই রাগ কোরে কোথায় চলে গিয়েছিস্, আমি তখুনি তোর খোঁজে বেরিয়ে পড়লুম। খালের ধার দিয়ে ঐ যে লাল মাটির রাস্তা এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে, ঐ পথ ধরে আমি এগিয়ে চল্লুম তোর খোঁজে। দু-পা যাই আর চেঁচাই—সৈরি, ও সৈরি—

কিন্তু তোর সাড়া নেই, মনে হয় আর একটু এগিয়ে গেলেই তোকে পাব। রাস্তার ধারে এক-একটা বড় গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াই, আর মনে হয় এতক্ষণ তুই সেখানে বসে ছিলি আমার সাড়া পেয়েই পালিয়েছিস্। আর বিশ্রাম করা হয় না, তখুনি উঠে তোর নাম ধরে চেঁচাতে-চেঁচাতে আবার ছুটি। এম্‌নি কোরে পাঁচ-ছটা গাঁ ছাড়িয়ে চলে গেলুম, কিন্তু তুই তখনো ধরা দিচ্ছিস্‌নে দেখে আমি বাঁশি বাজাতে সুরু করলুম। জানি, বাঁশি শুন্‌লে তুই আর থাকতে পার্‌বি না। বাঁশি বাজাতে-বাজাতে এগিয়ে চল্লুম, আর আমার ক্লান্তি, জলতেষ্টা সব চলে গেল। বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে-দিয়ে আমি আমার আহ্বানের সুর বাতাসে ছড়িয়ে দিতে লাগ্‌লুম—দূরে, দূরে, আরও দূরে—গলার স্বর যেখানে পৌঁছতে পারে না। সেই সুর আবার তোর কাছ থেকে ফিরে আস্‌তে লাগ্‌ল আমার কানে হাজার-গুণ মিষ্টি হোয়ে। তুই বল্‌ছিলি এই যে আমি, আমায় ধর দিকিন্। এই রকম লুকোচুরী খেলতে-খেলতে আমি এগিয়ে চলেছিলুম; হঠাৎ দেখলুম সূয্যি ডুবে গেছে। তখন আমার হুঁস হোলো, আর খেলা নয় এবার তো বাড়ী ফিরতে হবে। যদি এখন না ফিরি, তবে তুই যে আবার অন্ধকারে একা ফিরতে পার্‌বিনে।

বলতে-বলতে সুদামের চোখ দুটো জলে ভরে উঠ্‌ল। সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বস্‌ল। আমিও কি জানি তার দিকে চেয়ে থাকতে পারলুম না, অন্য দিকে ফিরে বস্‌লুম। কিছুক্ষণ পরে দেখি সে উঠে মাঠে নেমে গেছে।

আমি একলা সেই গাছের তলায় বসে-বসে ভাবতে লাগলুম সুদাম কি বল্লে! তার কথাগুলোর ঠিক অর্থ বুঝতে না পারলেও কিছু কিছু বুঝতে পারলুম। তার দুই চোখের সেই দু-ফোঁটা জল আমার চোখে ঝরণার ধারা বইয়ে দিলে! আমি সেই গাছতলায় বসে-বসে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লুম। কাঁদ্‌তে-কাঁদ্‌তে সেখানে শুয়ে পড়লুম, তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়লুম তা জানি না। সুদাম এসে আমায় ঠেলে তুলে দিলে, উঠে দেখি সন্ধ্যা হোয়ে গেছে।

সুদাম বল্‌লে—চল্, এখানে শুয়ে কেন, শরীরটা ভাল নেই বুঝি?

আমি বল্লুম—চল্, সন্ধ্যে হোয়ে গেছে।

পথে চলতে-চলতে একবার সুদাম বল্লে—আজ সন্ধ্যে রাতেই চাঁদ উঠ্‌বে, আসিস্ না লুকোচুরি খেল্‌ব।

—না ভাই তা হোলে মা ভারি ঝঞ্চাট বাধাবে।

সুদাম যেন একটু ক্ষুণ্ণ হোয়ে বল্লে—আচ্ছা থাক্। সারা-দিন বাইরে আছিস্ আবার বেরুলে তো বকবারই কথা।

সুদাম আপনার মনে বাঁশি বাজাতে-বাজাতে বাড়ী চলে গেল, আমিও বাড়ী গেলুম।

বাড়ীতে ঢুকতে না ঢুকতে মা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—পোড়ারমুখী সারাদিন কোথায় ছিলি? আজ যে তোর শ্বশুর এসেছিল। সারাদিন বসে-বসে এই যাচ্ছে।

মা আরও বল্লে—তোর শ্বশুর তোকে এবার নিয়ে যাবে।

সাতদিন বাদে ভাল দিন আছে, সেদিন জামাইকে নিয়ে আস্‌বে আর তোকে নিয়ে যাবে।

মার মুখে শুনলুম যে, এই দু-বছর ধরে নাগাড় মকদ্দমায়, আমার শ্বশুর একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হোয়ে পড়েছেন। শরীরও তাঁর ভেঙে পড়েছে, আমার স্বামী, যে জীবনে কখনো ক্ষেত খামারের কাজ করে-নি, আজ তাকে নিজে হাঁতে হাল ধরতে হয়েছে। শ্বশুর নাকি বলেছেন, মরবার আগে তাঁর মা লক্ষ্মীকে অর্থাৎ আমাকে নিয়ে গিয়ে তাঁর ঘরে প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

আমি মাকে বল্লুম—আমি কারো মা লক্ষ্মী-টক্ষী হোতে চাইনে, আমি শ্বশুরবাড়ী যাব না।

আমার মা খুব বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক ছিলেন। তা না হোলে বাবা মরে যাবার পর আমাদের যে কি হাল হোতো তা বলা যায় না। মা আমার কথা শুনে সে সময় রাগারাগি না কোরে বল্লে—মেয়ে-মানুষের কি ও-কথা বল্লে চলে মা। আমি যদি বাপের বাড়ী ছেড়ে চলে না আসতুম তা হোলে মা পেতিস্ কোথায় ?

আমি বল্লুম—ও-সব কথা তোর শুন্‌তে চাইনে, সেখানে পাঠালে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌ব সে কিন্তু তোকে বলে দিচ্ছি।

মা বল্লে—পাগলী মেয়ের শোনো কথা! আরে তোর বয়সী মেয়েদের শ্বশুর-ঘর যে পুরোণো হোয়ে গেল। তোর সঙ্গে যাদের বিয়ে হয়েছে তারা যে দু-তিন ছেলের মা। তোর

শ্বশুর ভালমানুষ তাই এতদিন তোকে বাপের বাড়ী রেখে দিয়েছে। আহা! মিনষের যা হাল হয়েছে, তার দিকে আর চাওয়া যায় না।

মার সঙ্গে তখন আর এ সম্বন্ধে কোনো কথা হোলো না। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লুম! নানা রকমের ভাবনায় ঘুম এল না। শ্বশুর-বাড়ী! মেয়ে-মানুষের শ্বশুর-বাড়ী ছাড়া আর উপায় নেই। কেন উপায় নেই—?

মা এসে শোবার আগে একবার ডাক্‌লে—সৈরি ঘুমিয়েচিস্‌?

আমি মট্‌কা মেরে পড়ে রইলুম, কোনো জবাব দিলুম না।

মাকে ছাড়তে হবে, সুদামকে ছাড়তে হবে। যাদের মধ্যে জন্মালুম, যাদের মধ্যে বড় হলুম, আপনার বলে এতদিন জানলুম তাদের সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। জন্মের মত ছেড়ে যেতে হবে! আবার সে এক নতুন সংসার, নতুন লোকজন—কি জানি সেখানকার লোকজন কেমন? না না, সে আমি পারব না, কিছুতেই পারব না।

পরদিন সকালে মা বল্লে—সৈরি আর বেরুস্‌-নি। সাতদিন পরে শ্বশুর-ঘর করতে যাবি এখন আর ধিঙ্গীর মত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে হবে না।

আমি কিন্তু কতক্ষণে সুদামের সঙ্গে দেখা কোরে তাকে খবরটা দেব সেই ছুতোয় ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। একবার মাঁর চোখের একটু আড়াল হোতেই আমি ছুটে সুদামদের

বাড়ীতে গিয়ে তাকে ডেকে বাইরে এনে বল্লুম—সর্ব্বনাশ হয়েছে!

—কি হয়েছে?

—কাল আমার শ্বশুর এসেছিল, তারা আমায় সাতদিন পরে নিতে আস্‌বে।

এঁ্যা! বলে সুদাম চম্‌কে উঠে, বল্লে—তবে উপায়!

—উপায় আর কি! জলে ডুবে মরা!

সুদাম অনেকক্ষণ চুপ কোরে থেকে বল্লে—না না তা করিস্‌নি। পালাবি? না, পালিয়েই বা যাবি কোথা?

আমি হতাশ হোয়ে বল্লুম—তবে কি করব? তারা আমায় নিশ্চয় নিয়ে যাবে। এতদিন রেখেছে আর রাখবে না।

সুদাম বল্লে—আচ্ছা তুই যা, তোর সঙ্গে পরে দেখা কোরে বল্‌ব, ভাবি আগে।

সুদামের সঙ্গে পরামর্শ কোরে কিছুই ঠিক হোলো না। বাড়ীতে বসে-বসে দিনরাত ভাবি কি কর্‌ব, কোথায় যাব, কেমন কোরে এই দারুণ বিপদ থেকে উদ্ধার পাব—কিছুই ঠিক কর্‌তে পারি না। এদিকে সুদামেরও দেখা পাইনে, মা দিন-রাত আমায় চোখে-চোখে রাখে, বাড়ী থেকে এক-পা কোথাও বেরোলে মা সঙ্গে যায়।

এমনি কোরে পাঁচ দিন কেটে গেল কিন্তু কিছুই হোলো না, সুদামও কোনো খোঁজ দিলে না, আমি হতাশ হোয়ে পড়লুম। ছ-দিনের দিন, সকালবেলা আমাদের জানালার ধারে যেন

সুদামের গলার শব্দ শুনতে পেলুম। আমি দিনরাত চক্ষু-কর্ণ সজাগ কোরে ছিলুম, গলার শব্দ পেতেই জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, সুদাম এসেছে। ছুটে বাইরে গিয়ে তাকে দরজার কাছে ডেকেছি এমন সময় কোথা থেকে মা এসে হাজির হোলো। আমি তার সঙ্গে কথা বলবার আগেই মা জিজ্ঞাসা করলে—কি রে সুদাম, কি চাই?

সুদাম অত্যন্ত অপরাধীর মত বল্লে—এই, এই শুনলুম সৈরি কাল চলে যাবে তাই দেখতে এলুম।

মা বল্লে—হ্যাঁ কাল ওর শ্বশুর আসবে—আর কতদিন বৌকে বাপের বাড়ী বসিয়ে রাখবে।

সুদাম এবার আমার দিকে চেয়ে বল্লে—শ্বশুরবাড়ী গিয়ে সৈরি আমাদের ভুলিস্-নে যেন!

সুদামের কথা শুনে আমার পা-দুটো থর্ থর্ কোরে কাঁপতে লাগল। এই কথা! এই কথা শোনার জন্যই কি আমি নিশিদিন এত উদ্গ্রীব হোয়ে বসেছিলুম। তার কথার জবাব দিতে পারলুম না। আমি তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সেও মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমার চাউনি তো আমি নিজে দেখতে পাইনি, তবে দেখলুম যে, আমার দৃষ্টির প্রতিবিম্ব তার চোখে ফুটে উঠেছে। আমার মনে হোতে লাগল, তার সেই দুটি আঁখিতারা দিয়ে এখুনি বুঝি প্রাণটা ফেটে বেরিয়ে পড়বে। মা যে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে তা একেবারে ভুলে গেলুম, আমি কাঁদতে-কাঁদতে মাটিতে বসে পড়লুম।

মা আমার হাত ধরে তুলে বল্লে—চল্, বাড়ীর ভেতরে যাই।

সুদাম আস্তে-আস্তে তার বাড়ীর দিকে চলে গেল। আমি মার দেহের ওপর ভর দিয়ে বাড়ীতে ঢুকলুম।

পরদিন সকালবেলা শ্বশুর ও আমার স্বামী এসে হাজির হলেন। দেখলুম, তাঁদের দুজনের চেহারাই বিশ্রী হোয়ে গেছে। আমার স্বামী এর আগে মাত্র দু-বার আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। তাঁকে আগে যে রকম দেখেছিলুম এবার তার চেয়ে অনেকখানি বড় বলে মনে হোলো।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার সময় মা আমার শ্বশুরকে বল্লেন—বেয়াই আজকের দিনটা এখানে থেকে যাও। জামাই এসেছে, সে থাকতে তো একদিনও শ্বশুরবাড়ীতে রাত্রিবাস করে-নি, আজকের রাতটা থাক, কাল সকালে যেও। আমি পাঁজি দেখিয়ে রেখেছি, কাল সকালে যাত্রা শুভ লিখেছে।

মার কথা শুনে প্রথমটা তিনি রাজী হন-নি, শেষে অনেক কোরে বলার পর তিনি সে দিনটা আমাদের বাড়ীতে থাকতে রাজী হলেন। আমি মনে করলুম, ভালোই হোলো, একটা দিন পাওয়া গেল, এর মধ্যে যদি সুদাম কিছু করতে পারে।

সমস্ত দিনটা আশায়-আশায় কাটল। মুমূর্ষুর প্রাণের আশা, কিন্তু কোথায় সুদাম! তার দেখা পেলুম না। দুপুর কাটল, বিকেল হোলো, সন্ধ্যা হোলো—কিন্তু কোথায় সে!

রাত্রিবেলা আমার ও স্বামীর শোবার জন্য একটা আলাদা

ঘর ঠিক করা হয়েছিল। আমার স্বামী খেয়ে সেখানে শুতে গেলেন। মা আমার হাতে পান দিয়ে সে ঘরে পাঠিয়ে দিলে। আমি স্বামীকে পানের বাটাটা দিতে যেতেই তিনি আমার হাত দুটো ধরে বল্লেন—সৌরভ, তোমার খাওয়া হয়েছে?

আমি ঘাড় নেড়ে "না" বলে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

রাত্রি এক প্রহর কেটে যাবার পর মা আমাকে খাইয়ে স্বামীর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল। স্বামী তখনো জেগে বসেছিলেন। আমি ঘরে ঢুকেই বিছানার একপাশে গিয়ে পড়ে রইলুম। তিনি কথাবার্ত্তা বলবার অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু আমি কোনো কথা না বলে চুপ কোরে রইলুম। শেষকালে তিনিও আর কথা না বলে শুয়ে রইলেন।

শুয়ে-শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছি। ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। ভাববার আর কিছু নেই, যেতেই হবে—তবুও ভাবনা! আমার স্বামী একবার আমার গায়ে হাত দিলেন, সরে গেলুম। বুঝলুম, তিনি পাশ ফিরে শুয়ে রইলেন।

স্বামী বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়লেন। আমার চোখে ঘুম নেই, রাত পোহালেই যেতে হবে। হঠাৎ নিশীথিনীর বুক চিরে বাঁশির সুর বেজে উঠল। বুঝলুম, সুদামও ঘুমোয়-নি, বাইরের দাওয়ায় বসে সে বাঁশি বাজাচ্ছে। বাঁশির সুর গুম্‌রে গুম্‌রে আমার রুদ্ধ দুয়ারে এসে আঘাত করতে লাগল। সে কি করুণ অনুনয়—যাস্‌-নে! ওরে যাস্‌-নে! আমাকে ফেলে যাস্‌-নে!

বিছানায় পড়ে দু-চোখের জলে আমার মাথার বালিশ ভিজে যেতে লাগল। বাঁশির অবিশ্রান্ত আকুতি—কোথায় যাবি তুই ?

আমার নিশ্বাসগুলো বুক ফেটে মাথার ওপরের খোলা জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। প্রতি নিশ্বাসে আমার বুকের খবর—সুদাম, চির সখা আমার, বিদায় দাও ? কি করব বন্ধু !

তবুও বাঁশির বিশ্রাম নাই, সেই এক মিনতি—কোথায় যাবি তুই ? আমায় ফেলে কোথায় যাবি ?

সকালে মা দরজা ধাক্কা দিয়ে আমায় তুলে দিলে। আমি একখানা লাল চেলী পরে কাঁদ্‌তে-কাঁদ্‌তে মার পায়ের ধুলো নিয়ে পাল্কীতে গিয়ে উঠ্‌লুম। পাড়ার অনেক গিন্নী, ছেলে মেয়ে, যুবক যুবতী যাবার সময় আমায় দেখতে এল, কিন্তু আমার সমস্ত মন-প্রাণ যাকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল, কেবল সে-ই এল না !

শ্বশুরবাড়ীতে এলুম। মস্ত জমির মধ্যে একখানা গোছাল একতলা ইঁটের বাড়ী। আমার স্বামী আমার হাত ধরে বাগান পুকুর, গোয়াল ইত্যাদি সব জায়গা দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালেন। সমস্ত দেখানো হোয়ে যাবার পর তিনি আমাকে বাগানের এক কোণে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে করুণভাবে বল্লেন—জান সৌরভ, আমাদের এই বাড়ী, বাগান সবই বাঁধা পড়েছে।

বুঝলুম, আমার স্বামী অত্যন্ত মনঃকষ্টে আছেন, কিন্তু তোমাদের সত্যি কোরে বলছি, তাঁর দুঃখে আমার তখন মোটেই সহানুভূতি জাগল না।

আমার শ্বশুর আমাকে বড় ভালবাসতেন। আমার শাশুড়ী প্রথম দিনকয়েক আমার ওপরে ভাল ব্যবহারই করেছিলেন, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তিনি নিজমূর্ত্তি ধারণ করলেন। নিজের বাড়ীতে মার কাছে আমায় ঘরের কাজ কিছুই করতে হোতো না। আমাদের ঘরকন্নার যা কিছু সামান্য কাজকর্ম্ম তা মা-ই করতেন। শ্বশুরবাড়ীতে আমার শাশুড়ী আমার ওপর নানারকম কাজের ভার চাপাতে লাগলেন। সে সব কাজ আমার জানা ছিল না, তাতে প্রায়ই গলদ হোতো। আমার শাশুড়ী তাই নিয়ে বাড়ী মাথায় কোরে তুলতেন। শ্বশুর আমার পক্ষ নিয়ে কোনো কথা বলতে গেলে শাশুড়ী ঠাকরুণ আরও গোল বাধাতেন। একদিন কি একটা কাজের জন্য আমার শাশুড়ী আমায় ভৎর্সনা করছিলেন আমি তার জবাব দেওয়ায় তিনি রেগে আমার বাবা ও মাকে অত্যন্ত বিশ্রী ভাষায় গালাগালি দিলেন। কথাগুলো আমার সহ্য হোলো না, আমিও তাঁকে কি বলায় তিনি কেঁদে-কেটে হুলুস্থূল বাধিয়ে তুল্লেন।

আমার শ্বশুর এম্‌নিতেই ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক ছিলেন। তার ওপর ইদানীং তাঁর শরীর এত খারাপ হোয়ে পড়েছিল যে, কদাচিৎ বিছানা ছেড়ে উঠতেন। শাশুড়ীর চীৎকারে প্রথম প্রথম তিনি আপত্তি করতেন, শেষে আর উপায় না দেখে মুখ বুঁজিয়ে থাকতেন। স্বামী সকালে বেরিয়ে যেতেন, আর সেই সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরতেন। রাত্রে আমি ঘরে গেলে কথাবার্ত্তা

জমাবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু আমার দিক থেকে কোনো উৎসাহ না পেয়ে চুপ-চাপ শুয়ে পড়তেন।

সেদিন সন্ধ্যার পরে আমি ঘরে যেতেই আমার স্বামী আমার একখানা হাত ধরে বল্লেন—সৌরভ,আজ তুমি মার মুখের ওপর চোপা করেছ?

আমি আর থাকতে পারলুম না। আমি বল্লুম—আর তোমার মা যে আমার বাপ তুলে গালাগাল দিলেন, তার কিছু হোলো না বুঝি?

স্বামী বল্লেন—মার মুখের ওপর অমন কোরে কিছু বোলো না সৌরভ, আমার অনুরোধ।

আমি রেগে বল্লুম—আমি কারো অনুরোধ শুনতে পারব না, আমায় বাড়ীতে রেখে এস।

আমার এ কথার ওপর তিনি আর কোনো কথা বল্লেন না। আমি ঘরের মধ্যে বসে-বসে কাঁদতে লাগলুম, তিনি বেরিয়ে চলে গেলেন।

আমার শ্বশুরের সম্পদের দিনে তাঁরা যে আমায় বাড়ীতে নিয়ে আসেন-নি এজন্য স্বামী ও শ্বশুর আমার কাছে অনেক সময়েই দুঃখ করতেন; কিন্তু আমি যে তাঁদের সেইদিনের জাঁক-জমক দেখি-নি এবং দুঃখের দিনের এই দুর্দ্দশা দেখছি আমার ওপরে শাশুড়ীর আক্রোশের এই একটা প্রধান কারণ ছিল। তিনি প্রায়ই এই সব কথা তুলে আমায় খোঁটা দিতেন।

সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি সমস্ত দিনটাই এমন কাজ কর্ম্ম ঝগড়া-ঝাঁটি ও অশান্তির মধ্যে কাট্‌তে লাগ্‌ল যে, অন্য কথা চিন্তা করবার আমার আর অবসর ছিল না। যে সুদামের মূর্ত্তি দিন রাত মনের মধ্যে ধ্যান করতুম, বছর দুয়েকের মধ্যে সপ্তাহে তার কথা একবারও মনে হোতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু তখনো আমি স্বামীকে ভালবাসতে পারি-নি। সুদামের চেয়ে তাঁর অনেক গুণ ছিল, সে আমার ওপর রাগ করত, দুই এক দিন কীল পর্য্যন্ত মেরেছে, কিন্তু আমার স্বামী আমার ওপর কখনো রেগে কথা পর্য্যন্ত কন-নি,—তা হোলে কি হবে! তাঁকে তখনো ভালবাসতে পারি-নি।

এমনি কোরে আমার শ্বশুরবাড়ীতে দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল। শ্বশুরবাড়ী সম্বন্ধে আগে মনের মধ্যে যে সব বিভীষিকা জাগ্‌ত, সেখানে গিয়ে দেখলুম যে, শ্বশুরবাড়ী তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ানক জিনিষ। নিজেদের বাড়ীতে ফিরে যাবার জন্য আমার মন ছট্‌ফট্‌ করতে থাকৃত। একদিন আমার স্বামীকে বল্লুম —আমাকে বাড়ীতে রেখে এস না!

তিনি হেসে বল্লেন—এই তো তোমার বাড়ী, আবার বাড়ী কোথায়?

আমি বল্লুম—এ আমার বাড়ী নয়, আমার মার কাছে রেখে এস।

কথাটা শুনে বোধহয় তাঁর দুঃখ হোলো, তিনি মুখখানা চুণ কোরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শ্বশুর দিনে-দিনে রোগে শয্যাশায়ী হোয়ে পড়তে লাগ্‌লেন, দিনরাত খেটে-খেটে আমার স্বামীরও শরীর ভেঙে পড়্‌ছিল। আমার শ্বশুরের ভিটে বন্ধক ছিল! গ্রামে এক ঘর ব্রাহ্মণ মহাজন ছিল, খুব পয়সাওয়ালা লোক তারা, মাসকাবারে তারা সুদের জন্য তাগাদা করতে আস্‌ত। ঘরে প্রায়ই টাকা থাক্‌ত না, এই নিয়ে সংসারে নানা অশান্তি হোতো। দারিদ্র্য কাকে বলে এতদিন তা আমার জানা ছিল না, কুকুরের মত সে আমার শ্বশুরের সংসারের পেছনে যতই ঘুরতে থাক্‌ত, আমার শাশুড়ী ঠাকরুণের মেজাজ ততই গরম হোতে থাক্‌ত। পাওনাদারের সুদের টাকা জম্‌তে লাগ্‌ল। সুদের সুদ বাড়তে লাগল, আর সে সব শোধ করবার জন্য আমার স্বামী পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এখানে-সেখানে যা একটু-আধটু জমি-জায়গা ছিল, তাও বিক্রি হোতে লাগ্‌ল, এই রকম কোরে আমাদের সংসার যখন দারিদ্র্যের চরম শিখরে উঠেছে তখন হঠাৎ একদিন শ্বশুর মারা গেলেন।

শ্বশুর মারা যাওয়ায় আমার স্বামী একেবারে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখলেন। এতদিন তবুও তাঁর মাথার ওপরে বাবা ছিলেন, জরাগ্রস্ত পিতা সংসারে সাহায্য করতে না পারলেও তবুও তিনি সংসারের একটা মস্ত ভরসা ছিলেন। কিন্তু মাথার ওপর থেকে সেই জীর্ণ আচ্ছাদনটুকুও সরে যাওয়ায় আমার স্বামী একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়্‌লেন।

শ্বশুরের মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকে আমার স্বামীর অত্যন্ত

খাটুনী বেড়েছিল। স্বামী অনেকটা তাঁর বাবার মতনই ধাৎ পেয়েছিলেন, হাজার অশান্তিতেও বিচলিত হতেন না। তবে ইদানীং তিনি বড় একটা কারো সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌তেন না।

শ্বশুরের মৃত্যুর পর থেকেই আমার শাশুড়ী রব তুল্লেন যে, আমি অলক্ষ্মী। তিনি যখন তাঁর স্বামীর জন্য ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদ্‌তে থাক্‌তেন, তখন প্রায়ই বল্‌তেন যে, এমন অলক্ষ্মী বৌ সংসারে নিয়ে এলুম যে, মিন্‌সে দুটো দিনও সুখে ঘর করতে পারলে না। বৌটো তাকে খেয়ে তবে ছাড়্‌ল।

প্রথম-প্রথম আমি তাঁর কথা গ্রাহ্য করতুম না। কথাগুলো আমার বুকে বাজ্‌লেও সেই শোকের সময় আর অশান্তির মাত্রা বাড়াবার ইচ্ছা হোতো না। কিন্তু ক্রমে যখন কথাটা নানা রকম পল্লবিত হোয়ে পাড়ার পাঁচজনের মুখে-মুখে ঘুর্‌তে আরম্ভ করল, তখন সেটা সহ্য করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হোয়ে উঠ্‌ল।

আমার শ্বশুরের শ্রাদ্ধ হোয়ে যাবার দিন কতক পরে একদিন আমার শাশুড়ী পাড়ার জনকতক গিন্নীর সাম্‌নে আমার নাম কোরে ঐ সব কথা বলায় সে দিন আমি আর থাক্‌তে পারলুম না। আমি শাশুড়ীকে কতকগুলো কড়া কথা শুনিয়ে দেবার জন্য তাঁর ঘরে যেতে গিয়ে বাইরে থেকে দেখলুম যে, ঘরের মধ্যে আমার স্বামী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। স্বামীকে দেখে আর ঘরের মধ্যে ঢোকা হোলো না। আমি সেখান

থেকে চলে এসে অন্ধকার ঘরের মধ্যে একলা বসে কাঁদতে লাগলুম।

অন্ধকারে নিঃশব্দে স্বামী কখন ঘরের মধ্যে ঢুকেছিলেন টের পাইনি। হঠাৎ তিনি দেশলাই দিয়ে প্রদীপটা জ্বালিয়ে ফেললেন। আমি থতমত খেয়ে উঠতেই তিনি আমার একখানা হাত ধরে গাঢ়স্বরে বল্লেন—সৌরভ বোসো, তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলি।

আমি বসতে তিনি ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আবার কাছে এসে বসলেন। তারপর অত্যন্ত শান্তভাবে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—কাঁদছিলে?

তাঁর কথার কোনো উত্তর দিলুম না।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটবার পর তিনি বল্লেন—তোমার মার কাছে যাবে?

মনে হোলো বলি—এখুনি, এখুনি! ওগো তোমার পায়ে পড়ি আমাকে মার কাছে রেখে এস। কিন্তু একটি কথাও বলতে পারলুম না।

স্বামী বলতে লাগলেন—দেখ, আমাদের এখানে তোমার খাওয়ার কষ্ট, পরার কষ্ট, তার ওপরে দিনরাত মার গঞ্জনা তো আছেই। তুমি যখন সেখানে যেতে চেয়েছিলে তখনই তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বাবার জন্য তোমায় তখন পাঠাই-নি। যাবে সেখানে?

এবারও আমি কোনো কথা বল্লুম না। কি জানি কেন,

তাঁর এই কথাগুলো শুন্‌তে আমার বড় ভাল লাগ্‌ছিল। তিনি আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন—তুমি যে আমায় মোটেই ভালবাস না তা আমি জানি। কিন্তু তোমায় বিয়ে করার জন্য আমি দায়ী নই, আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন আমার বয়স অত্যন্ত অল্প। আমার বাবা আমায় ইস্কুলে দিয়েছিলেন, সেখানে ছেলেরা তোমার নাম কোরে আমায় ক্ষেপাত। সে বয়সে তোমায় বিয়ে কোরে আমার অজ্ঞাতে তোমার ওপর যে অন্যায় করেছি তার জন্য আমায় ক্ষমা কোরো। তোমার ও আমার বাবা-মার দোষে আমরা দুজনেই শাস্তি পাচ্ছি।—

আমার স্বামী আরও কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন কিন্তু সে সব কথা আর আমার শোনা হোলো না। তাঁর কথাগুলো এত করুণ যে, আমি আর চোখের জল রাখতে পারলুম না, কেঁদে ফেল্লুম! মনে হোলো, আমার স্বামী! তুমি এত মহৎ, তোমায় চিনি-নি, তোমাকে কত কষ্ট দিয়েছি, আমায় ক্ষমা কোরো—আমার দোষ নিও না।

আমার স্বামী আদর কোরে আমার চোখ মুছিয়ে চুমু খেয়ে ঘর থেকে বোরিয়ে গেলেন! সেই দিন থেকে আমি তাঁকে ভালবাসতে আরম্ভ করলুম। জীবনের এই সন্ধ্যাকালে যৌবনের সেই এক সন্ধ্যার কথা স্মরণ হোলে আজও আমার চোখ সজল হোয়ে ওঠে।

স্বামীকে যেদিন থেকে ভালবাসতে আরম্ভ করলুম, সেদিন থেকে আমার জীবন কতকটা সহনীয় হোয়ে উঠল। আমাদের এই দারিদ্র্য, অনাহার সব তাতেই আমি একটা গর্ব্ব অনুভব করতে লাগলুম। আমি জানতুম যে, এখন যদি বাড়ীতে গিয়ে মার কাছে থাকি তা হোলে আমার খাওয়া কিংবা পরার কোনো কষ্টই থাকবে না। কিন্তু, স্বামীর সঙ্গে একত্রে দুঃখ-দারিদ্র্য ভোগ করার মধ্যেও যে সুখ আছে—সে সুখ ফেলে মার কাছে যেতে মন আমার চাইতো না। মধ্যে-মধ্যে শাশুড়ীর গঞ্জনা আমার পক্ষে

অসহ্য হোয়ে উঠ্‌ত বটে, কিন্তু স্বামীর মুখ চেয়ে আমি সব ভুলে থাক্‌তুম। সেই রাত্রির পর থেকে আমি ভাল কোরে লক্ষ্য করতে লাগ্‌লুম, আমার স্বামীর শরীরও দিনে-দিনে যেন ভাল হচ্ছে, আর তাঁর মন তো প্রফুল্ল ছিলই। সংসারের মধ্যে দুঃখ কষ্ট, অনাটন থাকা সত্ত্বেও পরিবারের কেমন একটা শ্রী ফিরে গেল। দিনগুলো আগের চেয়ে অনেক ভাল ভাবে কাট্‌তে লাগ্‌ল। ইতিমধ্যে আমার মা আমাকে নিয়ে যাবার জন্য একবার লোক পাঠিয়ে ছিলেন, কিন্তু স্বামীকে সেই দারিদ্র্যের মধ্যে একলা ফেলে চলে যেতে পার্‌লুম না, লোক ফিরিয়ে দিলুম।

বছরখানেক বেশ কাট্‌ল, কিন্তু আমাদের সেইটুকু সুখও বিধাতার সহ্য হোলো না। সেবার অনাবৃষ্টি হোয়ে আমাদের ধানের ফসল কিছুই হোলো না। জমিদারের খাজনা, মহাজনের সুদ কোথা থেকে পরিশোধ করা হবে! স্বামী আমার চিন্তায় দিনে-দিনে শুকিয়ে উঠ্‌তে লাগলেন। তখন আমি অন্তঃস্বত্বা। আমি লুকিয়ে মার কাছে কিছু টাকা চেয়ে পাঠালুম। আমার মা চাওয়া-মাত্র টাকা পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে ও স্বামীকে তাঁর কাছে গিয়ে থাক্‌তে অনুরোধ কোরে পাঠালেন।

মার টাকাগুলো এনে স্বামীর হাতে দিতেই তিনি চম্‌কে উঠে বল্লেন—টাকা কোথায় পেলে?

—মার কাছ থেকে আনিয়েছি।

তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হোয়ে বল্লেন—আমাদের অবস্থার কথা তাঁকে জানানো তোমার ঠিক হয়-নি।

আমি বল্লুম—কেন?

তিনি সে কথার জবাব না দিয়ে চুপ কোরে রইলেন। বুঝলুম, ধনীর সন্তান তিনি, ভাগ্য বিপর্য্যয়ে আজ এই অবস্থা হয়েছে। কিন্তু তাঁর অবস্থার কথা আত্মীয়-স্বজন টের পায় এটা তিনি পছন্দ করেন না।

অনেকক্ষণ চুপ কোরে থেকে তিনি বল্লেন—তোমার মা বিধবা মানুষ, তিনি কোথায় টাকা পাবেন। তার ওপরে আমাদের এই অবস্থার কথা জেনে তিনি কিছুতেই শান্তিতে দিন কাটাতে পারবেন না।

মনে হোলো মাকে জানানো সত্যই উচিত হয়-নি। কিন্তু সেবার আমার অনুরোধে টাকাটা তিনি গ্রহণ করলেন। সে টাকা দিয়ে কি করেছিলেন তা আমি জানি না।

আমাদের বাড়ীতে একটা ভাল পুকুর ছিল। আমি শ্বশুরবাড়ীতে এসেও সেটার অবস্থা ভাল দেখেছি, কিন্তু অযত্নে পুকুরটার অবস্থা শোচনীয় হোয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেখানকার জল অপেয় হোয়ে উঠতেই গাঁয়ের সেই বামুন মহাজনদের বড় পুকুর থেকে জল আন্‌তে হোতো। চাকর বাকর আমাদের ছিল না, আমার শাশুড়ীও বাতে নড়্‌তে পারতেন না, কাজেই আমাকেই সেখান থেকে জল আন্‌তে হোতো। পুকুর ঘাটে ও আমাদের বাড়ীতে দিনরাত জল্পনা চল্‌ত—আমার পেটে কি সন্তান আছে! কেউ বল্‌ত—ছেলে, কেউ বল্‌ত—মেয়ে! কেউ-কেউ আমার স্বামীর নাম ধরে

বল্ত—ওর এখন যে অবস্থা চলেছে তাতে মেয়ে হওয়াই সম্ভব। সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজে ছেলেই কামনা করতুম। অজাত সন্তানের উদ্দেশ্যে দিনরাত অনুনয় করতুম—আমার মান রাখিস্ বাবা—তোর অভাগিনী মার মান রাখিস্।

আমার শাশুড়ী বাতে ক্রমেই শয্যাশায়ী হোয়ে পড়তে লাগলেন। তিনি আমায় প্রায়ই শুনিয়ে-শুনিয়ে বল্তেন—মেয়ে যদি হয়, তা হোলে নটবরের আবার বিয়ে দেব।

শাশুড়ীর কথা শুনে আমার হাসি পেত।

একদিন আমার স্বামী তাঁর মার মুখে বিয়ের কথা শুনে হাস্তে-হাস্তে বল্লেন—ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌকে খাওয়াবে কি?

শাশুড়ী তখুনি জবাব দিলেন—চাঁড়ালের ঘরে তো আর বিয়ে দেব না যে, টাকা দিয়ে মেয়ে কিন্তে হবে! তোর বিয়ে দিয়ে বৌও আন্‌ব, সঙ্গে-সঙ্গে টাকাও আন্‌ব।

আমি কাছেই দাঁড়িয়েছিলুম। কথাটা কার উদ্দেশ্যে বলা হোলো তা আর আমার বুঝতে বাকী রইল না। আমার স্বামী হাসতে-হাসতে কথা সুরু করেছিলেন, তিনি আর কোনো জবাব না দিয়ে চুপ কোরে রইলেন। তারপরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমার মুখের দিকে করুণ চোখে চেয়ে রইলেন, কোনো কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল না।

আমার সন্তান হওয়ার দিন ক্রমেই এগিয়ে আস্তে লাগল। পাড়ার গিন্নীরা বলাবলি করত যে, আমার নাকি বয়স বড্ড

বেশী হোয়ে গিয়েছে, কি হয় বলা যায় না। আমার মনে হোতো নিশ্চয় এবার আমি মারা যাব। আমার স্বামী আমাকে আশ্বাস দিতেন—কিছু ভয় নেই। তিনি যতক্ষণ কাছে থাকতেন ও আশ্বাস দিতেন, ততক্ষণ সত্যিই মনে হোতো, কিছু ভয় নেই। কিন্তু স্বামী চোখের আড়াল হোলেই মনে হোতো এবার আমার রক্ষে নেই।

সময় পূর্ণ হবার কিছুদিন আগে আমি স্বামীকে বলে মার কাছে খবর পাঠালুম। মা এসে আমার কাছে রইলেন। মাকে বলতুম—কি হবে মা!

মা বলত—কি আবার হবে? মা হোতে গেলে ও কষ্ট সবাইকেই সহ্য করতে হয়।

একদিন ভোর রাত্রে আমার পেটে একটু-একটু বেদনা হোয়ে ঘুম ভেঙে গেল। আমার মনে হোলো, প্রসব বেদনা উপস্থিত! আমি মাকে খবর দিলুম। মা এসে আমার পাশে বসলেন। তারপর শাশুড়ী এলেন, ক্রমে পাড়ার দুই একজন প্রসবের কাজে অভিজ্ঞা গিন্নী এসে জুট্‌তে লাগলেন। সবার মুখ দেখে ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ব্যথা ক্রমেই বাড়্‌তে লাগল, মাকে বল্লুম—আর তো পারিনা মা।

মা বল্লেন—সহ্য কর মা, ভগবানের নাম কর।

মার কথা শুনে আমার বুক শুকিয়ে উঠ্‌ল। ভগবানের নাম! তবে কি আমি সত্যিই বাঁচ্‌ব না। লোককে তো মরবার সময়েই হরিনাম শোনায়। তবে কি তাই হোলো?

এতদিন যা ভেবেছিলুম তাই ঘট্‌ল। একবার আমার চারপাশের সবার দিকে চেয়ে দেখলুম ; কেউ বা গল্প করছে, কেউ বা গম্ভীর মুখে বসে রয়েছে। আমার এত যন্ত্রণা হচ্ছিল যে, তাদের কথা আমার কানে যাচ্ছিল না। আমার মনে হোতে লাগ্‌ল, তারা যেন আমার মরণের কথাই বলাবলি করছে। আমার সন্তান যাকে এতদিন ধরে গর্ভে ধারণ করলুম তাকে আদর করতে পারব না! শাশুড়ী আবার আমার স্বামীর বিয়ে দেবে! সে এসে আমার সন্তানকে কখনই যত্ন করবে না। ছেলে যদি হয় তবু ভাল, কিন্তু যদি মেয়ে হয়, তাকে তো সারাজীবন আমারই মত কষ্ট পেতে হবে। হয়তো আমারই মতন অবস্থায় তার মৃত্যু হবে। মনের মধ্যে দিয়ে ধাঁ-ধাঁ কোরে এক একখানা ছবি ফুটে উঠে সঙ্গে-সঙ্গে মিলিয়ে যেতে লাগ্‌ল।

যন্ত্রণা যত বাড়্‌তে লাগল আমার জ্ঞানও যেন লোপ পেতে লাগ্‌ল। আমি মার মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, তাঁর চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। মার হাত ধরে বল্লুম—একবার তাঁকে ডাক, শেষ দেখা দেখে যাই।

আমার মা শাশুড়ীকে ডেকে বল্লেন—বেয়ান, একবার নটবরকে ডাক তো, সৈরি তাকে দেখতে চাইছে।

শাশুড়ি ঝাঁকুরি মেরে বলে উঠলেন—হ্যাঁ, আর ডাকবার সময় পেলে না।

কথাটা কানে আসার সঙ্গে-সঙ্গে একটা দারুণ যন্ত্রণায় আমার জ্ঞান হারিয়ে যাবার মতন অবস্থা হোলো. নিজের জ্ঞানকে ঠিক

কোরে রাখবার জন্য একটা চরম চেষ্টা করলুম। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই শিশুর চীৎকার আমার কানে গেল—তারপরের কি হয়েছে আর আমার মনে নেই।

কতক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিলুম জানি না। একবার যেন ক্ষীণ জ্ঞান এসেছিল। ঘরের মধ্যে যারা ছিল তাদের কথাবার্ত্তার আওয়াজ একবার কানে এল। দেহের সে যন্ত্রণা আর নাই একটা দারুণ অবসাদে আমার হাত-পা সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই আবার জ্ঞানহারা হোয়ে পড়লুম। একবার যেন স্বামীর গলার আওয়াজ পেলুম—তিনি বল্লেন—সৈরি, হাঁ করত মা।

আমি হা করলুম। আমার মুখের মধ্যে যেন জলের মত কি একটা জিনিষ চাম্‌চে কোরে ঢেলে দেওয়া হোলো। সেটা জল না দুধ না সরবৎ কোনো আস্বাদনই পেলুম না। তার পরে আবার অজ্ঞান হোয়ে পড়লুম।

সমস্ত দিনটাই কি রকম আচ্ছন্নের ঘোরে পড়ে রইলুম। যখন সম্পূর্ণ জ্ঞান হোলো, তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। চোখ চেয়ে দেখলুম, মাথার কাছে আমার স্বামী বসে রয়েছেন, তিনি ধীরে-ধীরে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আমি চোখ চাইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন লাগছে সৌরভ?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে?

স্বামী বল্লেন—ছেলে হয়েছে।

আনন্দে আর কোনো কথা বলতে পারলুম না। আমার দুই চোখ উপ্‌চে জল গড়িয়ে পড়্‌ল। স্বামী তাঁর কোঁচার খুঁট দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে ঝুঁকে আমার কপালে একটা চুমু খেয়ে বল্লেন—আমি যাই সৌরভ, আঁতুড় ঘরে ঢুকেছি দেখলে ভারি গোল বাধ্‌বে।

এই কথা বলে আস্তে-আস্তে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

শিশুর আগমনে আমাদের গৃহের চেহারা ফিরে গেল। কত পুরোন জিনিষ ভাঙল, কত ভাঙা জিনিষ আবার নতুন কোরে তৈরি হোলো। আমাদের পরিবারের মধ্যে দিন-রাত্রি যে অশান্তির আগুন জ্বল্‌ছিল এক ফোঁটা সেই দেবতার আশীর্ব্বাদে সে আগুন অনেকটা শান্ত হোলো। আমার শাশুড়ী যিনি দিনরাত ঝগড়া, গালাগাল, খিটিমিটি নিয়েই থাকতে ভালবাসতেন, নাতিকে পেয়ে তিনি সব ভুলে গেলেন। সে যেন তাঁর প্রধান অবলম্বন হোয়ে উঠল। শাশুড়ী তাঁর নাম

দিলেন দীননাথ। দীনুর যখন মাস পাঁচেক বয়েস তখনই তিনি তাকে আমার কাছ থেকে তুলে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন।

দীননাথ আসার পর থেকে একদিকে যেমন সংসারের অশান্তি কম্‌ল, অন্য দিকে দারিদ্র্য তেম্‌নি কঠোর মূর্ত্তিতে আমাদের দেখা দিলে। বাড়ীতে যে গাই গরু ছিল শশুরের অসুখের সময়েই সেগুলো বেচে ফেলতে হয়েছিল। আমার স্বামীর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল তার ওপরে ছেলে-বেলা থেকেই তাঁর দুধ খাওয়া অভ্যেস। দুধ না খেতে পেয়ে তাঁর শরীর আরও খারাপ হোয়ে পড়্‌ছিল, কিন্তু দীনুকে তো আর দুধ না খাইয়ে রাখা যায় না। এদিকে গয়লাকে টাকা দেব এমন অর্থও নেই। আমি আমার স্বামীকে না জানিয়ে আমার সোনার হারছড়া বেচে ফেল্লুম। কিন্তু, তাতে আর কতদিন চল্‌বে! সেই টাকা থেকে মাঝে-মাঝে সংসার-খরচের জন্যও কিছু দিতে হোতো, আবার দীনুর দুধের অনাটন পড়্‌তে লাগ্‌ল।

আমার মা চার-পাঁচ দিন অন্তরেই দীনুর খবর নিতে পাঠাতেন। একবার আমি তাঁর কাছে দীনুর দুধের জন্য কিছু টাকা চেয়ে পাঠালুম। এবার কিন্তু টাকা আসবার আগেই আমি স্বামীকে সে কথা জানিয়েছিলুম। দারিদ্র্যের পেষণ তাঁর আর সে মনের জোর ছিল না। আমার কথা শুনে হতাশভাবে বল্লেন—বেশ করেছ, ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে তো।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে একটা চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—ভগবান আমার ঘরে ছেলে পাঠালেন কেন—তাও বুঝতে পারি না।

আমি তাঁর মুখ চেপে ধরলুম—ওগো অমন কথা মুখেও এনো-না।

যাকে দেখবার পর থেকে আমার দীনুর আর কোনো কষ্টই রইল না। যার সংসারে আর কোনো লোক ছিল না। তাঁর কিছু টাকা ছিল সে টাকা ভাল জায়গায় খাটত, তার ওপরে ক্ষেতের ফসলও ছিল, ওদিকে খরচও ছিল কম। তিনি যে প্রতিমাসে দীনুর নামে দুধের খরচ বলে কয়েকটা নগদ টাকা দিচ্ছেন একথা আমার শাশুড়ী জান্‌তেন না, তবে প্রায়ই দীনুর জামা কাপড় আসায় তিনি বেশ খুসীই ছিলেন।

ছেলে আমার একটু-একটু কোরে বড় হোতে লাগ্‌ল। তার কচি-মুখে আধ-আধ মা-মা বুলি আমার যে কি ভালো লাগ্‌ত তা তোমাদের কি কোরে বোঝাব। কিন্তু আমি যখনই দেখেছি যে আমার সুখের মাত্রা কানায়-কানায় পূর্ণ হবার উপক্রম হয়েছে, তখনই নির্ম্মম অদৃষ্ট আমার হাত থেকে সে পাত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। সুখের আনাচে-কানাচে দুঃখ ঘুরে বেড়াচ্ছে, জীবনের পায়ে-পায়ে মৃত্যু ঘুরে বেড়ায় এ আমরা দেখেও দেখি-না।

স্বামীর সংসারে এসে আমি যে সব কষ্টভোগ করছিলুম পুত্রের মুখ দেখে আমি সে সবই ভুলে গিয়েছিলুম। কিন্তু, দুঃখ আমার

নতুন রূপ ধরে আমাদের আক্রমণ করতে আরম্ভ করলে। আমার শ্বশুর যাঁদের কাছে বাড়ী বন্ধক রেখেছিলেন তারা আসল টাকার দাবী করতে লাগ্‌ল। আমরা নিজেরাই তখন খেতে পাইনে, সে কয়েক হাজার টাকা তখন কোথা থেকে শোধ দেব। আমার স্বামী অন্য কাউকে বাড়ীটা বাঁধা দিয়ে মহাজনদের টাকা শোধ কোরে দেবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লেন। আমাদের জাতের যে ক'ঘর লোক গাঁয়ে ছিল তাদের সবার অবস্থাই আমাদের মতন না হোলেও বাড়ী বাঁধা নিয়ে টাকা দিতে পারে এমন অবস্থা কারো ছিল না। গ্রামের মধ্যে বড়লোক ছিল দু-ঘর। এক ঘর ছিল সেই বামুন মহাজনেরা যারা আমাদের টাকা দিয়েছিল, আর এক ঘর—তারা কায়স্থ বড়লোক। তারা ছিল জমিদার, তাদের সঙ্গেই মামলা কোরে আমার শ্বশুর সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন। স্বামীর মুখে শুনেছিলুম যে, আমার শ্বশুরের কাছ থেকে একটা জমি ফাঁকি দিয়ে নেবার চেষ্টা কোরে না পারায় শেষকালে তারা একটা মিথ্যে মামলা সাজিয়েছিল। আমার শ্বশুরও ছিলেন জেদী লোক, তখন সেটা কিছুতেই ছাড়্‌লেন না। জমিদাররা বল্লে—ছোটলোকের পয়সা হয়েছে দেখি একবার! আমার শ্বশুর বল্লেন—ধর্ম্ম আছে দেখি একবার! শেষকালে টাকার জোরে ধর্ম্ম পেছিয়ে গেল তারা মামলা জিতে নিলে। সেই মামলায় শ্বশুর সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়্‌লেন।

জমিদারদের কাছে গেলে তারা বাড়ীটা বাঁধা রাখতে

পারত। সেখান থেকে প্রস্তাব নিয়ে আমাদের কাছে লোকও এসেছিল, কিন্তু আমার স্বামী কিছুতেই তাদের কাছে গেলেন না। তিনি এই জন্য শহরে হাঁটাহাটি সুরু করলেন। আমাদের গ্রাম থেকে শহর প্রায় তেইশ চব্বিশ মাইল দূরে। গরুর গাড়ী চড়ে যাবার সংস্থান আমাদের ছিল না, কাজেই তাঁকে হেঁটেই যাতায়াত করতে হোতো। বার দুয়েক যাতায়াত করতে না করতেই তিনি বিছানায় পড়লেন। তখন চাষের সময়, সব কাজ বন্ধ রইল। প্রায় মাসখানেক ভুগে অস্থি-চর্ম্ম-সার হোয়ে, তিনি বিছানা থেকে উঠলেন।

স্বামীর অসুস্থতার জন্য মহাজনের তাগাদা কমলো না। তারা রোজ তাগাদায়-তাগাদায় আমাদের অস্থির কোরে তুলতে লাগল। শেষকালে আর উপায় না দেখে আমার স্বামী মহাজনের কাছেই ভিটেটা বিক্রি করবার প্রস্তাব করলেন। তারা প্রথমে এ প্রস্তাবে রাজী হোলো না। শেষকালে সামান্য কিছু টাকা নিয়ে তাদের কাছে ভিটে বিক্রি কোরে দেওয়া হোলো। সেই টাকায় খানিকটা জমি জমা নিয়ে আমাদের নতুন খড়ের ঘর তৈরি হোলো।

যেদিন আমরা পুরোণো বাড়ী ছেড়ে দিয়ে আমাদের নতুন খড়ের বাড়ীতে যাই, সেদিনকার কথা কখনো ভুলব না। জিনিষপত্র আমাদের যা কিছু ছিল তা আগেই নতুন বাড়ীতে চালান কোরে দেওয়া হয়েছিল, কেবল রান্নাঘরের হাঁড়ি পাতিলগুলো ছিল—যেগুলো ফেলে যেতে হবে। সকাল

বেলাকার খাওয়া-দাওয়া শেষ কোরে বেলা তিনটে নাগাদ আমরা বাড়ী ছাড়বার উদ্যোগ করলুম। আমার শ্বশুরের এই ভিটে থেকে নতুন বাড়ী মিনিট পাঁচেকের পথ মাত্র। বাড়ী থেকে বেরোবার আগেই উঠোনে দাঁড়িয়ে আমার শাশুড়ী ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ঠাকুরমাকে কাঁদতে দেখে দীনুও তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল। আমার স্বামী দাওয়ার একখানা থাম ধরে নীরবে কাদতে লাগলেন। পাড়ার যে যেখানে ছিল সকলেই এসে সেখানে জুটতে লাগল। সকলের মুখই ভয়চকিত, সবার মুখেই হাহাকার! হায় হায়! শেষে ভিটে ছাড়তে হোলো! সকলেই আমার শ্বশুরের সম্পদের দিনের কথা তুলে নানারকম সান্ত্বনা দিতে লাগল। আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগছিল যে, মেয়ে যখন তার বাপের-বাড়ী জন্মের মত ছেড়ে দিয়ে শ্বশুর-ঘর করতে যায়, তখন তার প্রাণে যে ব্যথা বাজে, সে ব্যথা কি ভিটে ছাড়ার ব্যথার চেয়ে কম!

উঠোনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে আমারা দৈন্যের লজ্জা ঢেকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

নতুন বাড়ীতে এসে আবার নতুন কোরে সংসার পাতলুম। কিন্তু আমার শাশুড়ী সেই যে এসে বিছানা নিলেন আর উঠলেন না। দু-দিন তিন দিন অন্তরও একবার তাঁকে জোর কোরে খাওয়াতে পারতুম না। সমস্ত দিনের মধ্যে একবার হয়তো তাঁর নাতির সঙ্গে কথা বলতেন, আমার কিংবা তাঁর

ছেলের সঙ্গে একেবারেই কথা বল্‌তেন না। এই রকমে প্রায় মাস ছয়েকের মধ্যে তাঁর শরীর পাত হোয়ে গেল। শীতের কিছু আগে তার ভয়ানক পেটের অসুখ দেখা দিল। আমরা কবিরাজ ডাকালুম, কিন্তু তিনি ওষুধ খেলেন না। নিতান্ত গোলমাল করলে তিনি ওষুধ নিয়ে ফেলে দিতেন। বাড়ীর শোক তিনি আর ভুল্‌তে পারলেন না।

মানুষের হৃদয় বিচিত্র উপাদানে তৈরি। অপরে তো দূরের কথা, মানুষ নিজের হৃদয়কেই চিন্‌তে পারে না। মানুষ সুখে দুঃখে হাসে কাঁদে বাঁচে মরে, কিন্তু তার নিজের মধ্যে যে রহস্যময় জগৎ রয়েছে, তার কোন্ কোঠায় কি সঞ্চিত আছে তা সে জানেও না। আমার শ্বশুরের ভিটের ওপর শাশুড়ীর যে এত স্নেহ লুকোনো ছিল তা কোনো দিনও তাঁর কথায় কিংবা কাজে টের পাওয়া যেত না। বাড়ী বিক্রি সম্বন্ধে প্রায় দেড় বছর ধরে কথাবার্ত্তা চলেছিল। আমার স্বামী সে সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে প্রায় রোজই কথাবার্ত্তা বলতেন, দর-দস্তুর নিয়ে তিনিও কথা বল্‌তেন, বোধহয় ভিটে ছাড়্‌তে তাঁর মনে এত বড় আঘাত লাগ্‌বে সে কথা তিনি নিজেও বুঝতে পারেন-নি। ভিটের শোকে তিনি ছেলে নাতি সবার কথা ভুলে গেলেন। এমন আত্মহত্যা আমি কখনো দেখি-নি।

অনাহারে শুকিয়ে-শুকিয়ে শীতের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর মৃত্যু হোলো। মার শোকে আমার স্বামী কাঁদ্‌লেন, আমার ছেলে কাঁদ্‌ল, আমিও কাঁদ্‌লুম।

সেবারে পুজোর পর গাঁয়ে সকলেরই জ্বর হোতে লাগ্‌ল। প্রথমে আমার জ্বর হোলো, কয়েকদিন পরে আমি সেরে উঠ্‌তেই আমার স্বামী পড়্‌লেন। স্বামী একেই রোগা, জ্বরে তাঁকে আরও কাবু কোরে ফেল্লে। তিনি সারতে না সারতেই দীনু পড়্‌ল। দীনুর জ্বর আর ছাড়ে না, সাত আট দিন বাদে একদিন-দুদিন যদি জ্বর ছাড়্‌ল তো আবার এল, এমনি কোরে ছেলে আমার আধখানা হোয়ে গেল। শীত পড়তেই তার জ্বর ছাড়্‌ল বটে, কিন্তু তার শরীর একেবারে কালি হোয়ে গেল।

আমার স্বামীর শরীর একেবারে ভেঙে পড়ছিল, ক্ষেত খামারের কাজ তাঁর দ্বারা আর চলছিল না। আমাদের যা কিছু সামান্য চাষের জমি ছিল তা ভাগের বন্দোবস্ত কোরে দেওয়া হোলো।

একদিন বিকেলে আমার স্বামী এসে বল্লেন—দেখ নিজে হাতে চাষ-বাস করা তো উঠে গেল। অচ্যুত কাকা বলছিল যে, সে আমায় আদালতে একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারে। এখন টাকা বারো মাইনে দেবে কিছু উপরিও আছে, পরে আবার মাইনে বাড়বে। কি বল, যাব?

দরিদ্রের সংসার, যাদের দু-বেলা অন্নের সংস্থান হয় না, তাদের কাছে এটা যে কতবড় প্রলোভনের প্রস্তাব সে কথা সকলে বুঝতে পারবে না। আমি উৎসাহিত হোয়ে বল্লুম—বেশ তো!

—কিন্তু আমাকে শহরেই থাকতে হবে।

—ছুটি আছে তো?

—হ্যাঁ রবিবারে ছুটি আছে। কিন্তু সেই একদিনের ছুটির জন্য আবার দেড় টাকা গরুর গাড়ী ভাড়া দিয়ে তো আসা যাবে না।

—তবে কি চিরকাল শহরেই বাস করতে হবে?

—না, পূজোর সময় আর বড়দিনের সময় লম্বা ছুটি আছে।

দু-দিন স্বামী স্ত্রীতে অবিরাম পরামর্শ কোরে তাঁর যাওয়াই সাব্যস্ত হোলো। বাপের বাড়ী থেকে আসবার সময় আমি

যে পেঁট্‌রাটা নিয়ে এসেছিলুম সেইটেতে স্বামীর কাপড়-চোপড়, কিছু চিঁড়ে ও বাতাসা ভরে দিলুম। একদিন বিকেল বেলায় আমার স্বামী তাঁর প্রতিবেশী অচ্যুত কাকার সঙ্গে শহরে চাকরী করতে চলে গেলেন। যাবার সময় দীননাথকে কোলে তুলে চুমু খেয়ে নামিয়ে দিয়ে ছল-ছল চোখে আমায় বল্লেন—সাবধানে থেকো,—দীনুর শরীরটা ভাল নয়, যদি সুবিধা হয় তো তোমা-দেরও সেখানে নিয়ে যাব।

সেদিন আমার মনটা এত খারাপ হোয়ে গেল যে, রান্না বান্না কিছুই করলুম না। দীনুকে চাট্টি মুড়ি আর বাতাসা দিয়ে আমি বিছানায় এসে শুয়ে পড়লুম। বুক থেকে মোচড় দিয়ে-দিয়ে আমার কান্না ঠেলে আস্‌তে লাগ্‌ল। মনে হচ্ছিল, এমন একা আর কখনো হই-নি। আমার যেন সর্ব্বস্ব গিয়েছে, আমি যেন নিঃসম্বল হোয়ে পথের পাশে পড়ে আছি। পাশে দীনু অঘোর-নিদ্রায় অভিভূত, একবার তার গায়ে হাত দিলুম—আমার ছেলে, এই তো আমার সর্ব্বস্ব! কিন্তু তাতেও মন ভরল না। ছেলেবেলাকার কথাগুলো মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। বাড়ীতে আমার মা রয়েছে। মাও তো এমনি আমারই মত একলা ঘরে বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্ করছে। বিধা-তার এ কি বিধান!

কিছু দিনের মধ্যে আমার সবই সয়ে গেল। একলা ঘরকন্না করি। সকাল-বেলা দীনু খেলতে যায়, দুপুরবেলা এসে ঘুমিয়ে পড়ে, আবার বিকেলে খেলতে যায় সন্ধ্যের সময় এসে ঘুমিয়ে

পড়ে। কথা বলবার একটা লোক পাই-নে। ছেলেকে সে কথা খুলে বলতে পারিনে। যদিই বা তাকে একটু ধরে রাখতে যাই, খেলুড়ীদের জন্য তার মন কেমন করে! মার দুঃখ সে বোঝে না, হা রে ছেলে!

স্বামীর কাছ থেকে মাসে একখানা কি দু-খানা চিঠি আস্‌ত। আমি পড়তে জান্‌তুম না, অচ্যুত কাকার বাড়ীতে গিয়ে তার ছেলেকে দিয়ে পড়িয়ে আন্‌তুম। স্বামী লিখ্‌তেন, চাকরী বেশ হচ্ছে, দু-পয়সা রোজগারও হচ্ছে। আমি আকাশে বাড়ী তৈরি করতে-করতে বাড়ী ফিরতুম। মনে হোতো এবার আর আমাদের কোনো দুঃখ থাক্‌বে না, আমার স্বামীও আমার শ্বশুরের মত বালাখানা তৈরি করবে।

একদিন দুপুর-বেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে গা গড়াচ্ছি এমন সময় দীনু এসে বল্লে—মা দিদিমার কাছে থেকে একটা লোক এসেছে—তোকে ডাক্‌ছে।

মার কাছ থেকে টাকা-কড়ি জিনিষপত্র নিয়ে আমার কাছে যে আস্‌ত সে একজন স্ত্রীলোক। আমাদের বাড়ীর কাছেই সে থাকে, বরাবরই আমাদের আশ্রিতা। আজকে হঠাৎ অন্য কেউ এসেছে শুনে আমার বুকটা ধড়াস্ কোরে উঠল—মার কিছু হয়-নি তো?

চঞ্চল-পদে বাইরে গিয়া দেখি,—সুদাম!

সুদাম বসে-বসে দীনুর সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছে। সুদামকে দেখেই কি জানি আমি সংকোচে আর

অগ্রসর হোতে পারলুম না। সেইখানেই দাঁড়ালুম। দাঁড়িয়ে তাদের আলাপ্ শুন্‌তে লাগলুম।

সুদাম দীনুকে নানারকম প্রশ্ন করছিল, দীনুও হড়্‌বড়্ কোরে যা-তা বলে চলেছিল। হঠাৎ সুদাম বলে উঠ্‌ল—কি রে দীনু তোর মা এল না?

দীনু ছুটে বাড়ীর ভিতরে আসছিল, পথেই আমার সঙ্গে দেখা, আমি তার হাত ধরে সুদামের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। সুদাম আমাকে দেখে বল্লে—ইস্! তোর কি চেহারা হোয়ে গেছে রে সৈরি? আর চেনা যায় না যে!

আমি বল্লুম—আর মলুম কি বাঁচলুম তা একবার খোঁজ নিয়েও তো দেখ না।

সুদাম বল্লে—বাবা মরবার পর সবই আমার ঘাড়ে পড়েছে জানিস তো? সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি ফুরসৎই মেলে না। আজ এখানে এসেছিলুম একটা কাজে, ভাবলুম যাই একবার সৈরির সঙ্গে দেখা কোরে!

সুদাম আমাদের গ্রামের অনেক খবর দিতে লাগল। ভামিনী বিধবা হোয়েছে, সত্য কামারের সেই বিধবা মেয়েটাকে হরিশ স্যাকরার ছেলে বের কোরে নিয়ে গেছে। গাঁয়ে দু-ঘর মোছলমান এসে ঘর করেছে। সেখানে ছেলেদের একটা স্কুল হয়েছে। ছেলেরা গোলা খেলে। আরও কত রকম খবর!

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—বৌ কেমন হয়েছে?

সুদাম কোনো জবাব না দিয়ে দীনুকে বল্লে—এই দীনু তোদের বাড়ীতে তামাক-টামাক নেই ?

দীনু বল্লে—বাবা তামাক খায় না।

সুদাম হাসতে-হাসতে বল্লে—তোর বাপ কি বেহ্মজ্ঞানী হয়েছে নাকি রে ?

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম—বৌ কেমন আছে ?

এবার সুদাম বল্লে—তার কথা আর বলিস্-নি। একেই শরীর রোগা, তার ওপরে আবার একটা মেয়ে হোয়ে আর নড়তে-চড়তে পারে না।

আমি বল্লুম—বিয়ের সময়ে একটা খবরও দিলে না, বেশ যা হোক্!

সুদাম বল্লে—তোদের তো বলতে এঁসেছিলুম! এসেই দেখি বাড়ীতে মড়া-কান্না! বেরিয়ে এসে একটা লোককে জিজ্ঞেস কোরে জানলুম যে, মহাজনের দেনার দায়ে সেদিন তোদের ভিটে ছাড়তে হবে। আমি দূরে গিয়ে একটা গাছ-তলায় দাঁড়িয়ে রইলুম, যদি ফাঁকায় তোর দেখা পাই। সন্ধ্যে অবধি বসে-বসে দেখলুম তোরা কাঁদ্‌তে-কাঁদ্‌তে বেরিয়ে চলে গেলি, আমিও ধূলো-পায়েই ফিরে গেলুম।

সুদামের কথা শুনে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবার উপক্রম হোলো। ভগবান! আমাদের সেই চরম লজ্জা ও দুর্দ্দশা অন্ততঃ এই লোকটাকে না দেখিয়ে দিলে কি তোমার সৃষ্টির কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত!

একবার ইচ্ছে হোলো জিজ্ঞাসা করি—বৌ নিয়ে কেমন আছ, সুখে আছ তো? কিন্তু তখুনি মনে হোলো—না না থাক্! সুখে আছে সে, নিশ্চয়ই সুখে আছে, পৃথিবীর সকলেই সুখে আছে, সকলেই সুখে থাক। আমি অভাগিনী—না না আমিই বা কি কম সুখে আছি! আমার মতন স্বামী ক'জনার আছে? আমি দরিদ্র বটে, কিন্তু চাষার ঘরে ধন কোথায়? আমার সোনার চাঁদ ছেলে রয়েছে—আমার যা দুঃখু! সব দুঃখু আমার ছেলে ঘুচিয়ে দেবে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ কোরে কেটে গেল। আষাঢ়ের দীর্ঘ দ্বিপ্রহর তখনো কাটে-নি, উঠোনের কোনে বড় গোছের এক টুকরো রোদ তখনো জ্বলছিল। সুদাম তার পিরানের পকেট থেকে একটা বিড়ি বার কোরে সেটাকে ধরাতে-ধরাতে বল্লে—কি গরম পড়েছে দেখেছিস্। কবে যে দেবতা দয়া করবে—কি জানি।

আমি বল্লুম—গরমটা কম্‌লে একদিন বৌকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এস না, তাকে দেখতে ইচ্ছা করে।

মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া গল্‌গল্ কোরে বার কোরে দিয়ে সুদাম বল্লে—হারে আমার কপাল! সে কি উঠতে পারে, না নড়তে পারে। সে আজ দু-তিন মাস শয্যাশায়ী!

একটা কথা সুদামকে জিজ্ঞাসা করবার প্রলোভন সাম্‌লাতে পারলুম না। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—বৌকে মার-ধর কর না তো?

সুদাম এক ঝলক্ হেসে বল্লে—না রে না!

ঘরে মুড়ি ছিল, সুদামকে খেতে দিলুম। রোদ পড়্তে সে উঠে চলে গেল।

সুদাম চলে যেতে দীনু বল্লে—ও কে মা?

—ও, ও তোর মামা হয়।

পূজোর ছুটির সময় স্বামী বাড়ীতে এলেন। আসবার সময় শহর থেকে আমার জন্য দু-জোড়া ফুল-পেড়ে শাড়ী, দীননাথের জন্য দু-জোড়া ধুতি, একটা জামা ও এক জোড়া জুতো কিনে নিয়ে এলেন। এই ক'মাসে তিনি উপরি আয় থেকে পঞ্চাশ টাকা জমিয়ে ছিলেন। সেই টাকা আমাকে দিয়ে বল্লেন,—কয়েক মাস এতেই চালাতে হবে। বড়দিনের আগে আর তো আসা হবে না।

পূজোর সময় বারো দিন ছুটি ছিল। এই বারো দিন চব্বিশ ঘণ্টা আমরা স্বামী স্ত্রীতে কেবল সুখের কল্পনা করলুম। আবার জমি কিন্তে হবে, জমিই আমাদের লক্ষ্মী। আবার আমাদের মরাই-ভরা ধান হবে, গোয়াল-ভরা গরু হবে। আমরা দুটিতে তখন চকা-চকির মত থাকব। দীনুর বিয়ে দেব, চাঁদ-পানা বৌ আনব। যে বাড়ী আমাদের বিক্রি হোয়ে গেছে, মহাজনের হাতে-পায়ে ধরে সেই বাড়ী আবার কিনে নেব। দেখতে-দেখতে বারো দিন কেটে গেল, স্বামীর যাবার দিন এগিয়ে এল। তাঁরা চলে গেলেন।

পূজোর কিছু পরেই আবার সেই পোড়া জ্বরে গ্রাম ছেয়ে

গেল। দীনু আবার বিছানায় পড়্ল। আমি তাকে কবরেজের ওষুধ খাওয়াতে লাগলুম। কিছুতেই জ্বর ছাড়ে না। কত মাদুলী-দেওয়া হোলো, কত মানৎ করা হোলো, কিছুতেই কিছু হোলো না। বড়দিনের সময় স্বামী এলেন, তিনি যে কটা টাকা এনেছিলেন দীনুর ওষুধের খরচেই ফুরিয়ে গেল। স্বামী বেশী দিন বাড়ীতে থাক্তে পারলেন না। বড়দিনের ছুটি পূজোর ছুটির মত লম্বা নয়, যমের মুখ আগ্লাবার জন্য আমাকে একলা ফেলে রেখে তিনি শহরে চলে গেলেন।

শীতের শেষে দেবতা যেন মুখ তুলে চাইলেন। দীনুর জ্বর ছেড়ে গেল। যেদিন সে পথ্যি পেলে তার পরদিন দু-ক্রোশ হেঁটে গিয়ে আমি চণ্ডীতলায় পূজো দিয়ে এলুম।

আমার স্বামী দু-বারে যত টাকা দিয়েছিলেন, তা দীনুর অসুখেই খরচ হোয়ে গেল। প্রথম-বারে টাকা পেয়ে মনে করেছিলুম যে, তা থেকে কিছু জমিয়ে রাখব। কিন্তু তা আর হোলো না। আমাদের মায়ে-পোয়ের খরচ খুবই কম ছিল, কিন্তু কবরেজের ওষুধ আর ছেলের পথ্য জোগাতেই সব চলে গেল। আমি তো একবেলা খেতুম, স্বামীর কাছে টাকা চেয়ে পাঠিয়ে তাঁকে বিব্রত করতে ইচ্ছা হোতো না। যখন একেবারে অসহ্য হোয়ে উঠ্‌ত, মার কাছ থেকে দুটো একটা টাকা চেয়ে

আনতুম। আমার কষ্ট দেখে মা মাঝে-মাঝে আমাদের সেখানে গিয়ে থাকতে বলতেন, কিন্তু স্বামী কি মনে করবেন এই ভেবে যেতে পারতুম না। এক-একবার দীনুকে পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছা হোতো। আমাদের এখানে দুধ নেই, ছেলেটাকে দু-বেলা পেট ভরে ভাতই খাওয়াতে পারি না তা দুধ পাব কোথা থেকে।

মার ওখানে পাড়ার লোকে দুধ খায়। ছেলেটার কষ্ট দেখে স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি চাইবার ইচ্ছে হোতো, কিন্তু তখুনি মনে হোতো, সব কথা খুলে লিখলে তাঁর আর অশান্তির সীমা থাকবে না। হয়তো পয়সা রোজগার করবার জন্য তিনি আরও বেশী কোরে খাটতে সুরু করবেন। একে তাঁর শরীরের যে অবস্থা, তার ওপরে অত বেশী পরিশ্রম সহ্য হবে না।

একবার কিসের চারদিনের ছুটীতে স্বামী বাড়ীতে এলেন। এসেই আমাদের অবস্থা বুঝতে পারলেন। আমাকে ডেকে বল্লেন—তোমাদের এমন হাল হয়েছে আমাকে লেখ-নি কেন?

স্বামীর সেই কথা শুনে কেন জানিনা সেদিন আমার ভারী অভিমান হোলো। তাঁকে বলে ফেল্লুম—লিখব আর কি? দীনুর অসুখে যে-সব টাকা খরচ হোয়ে গেল সে কথা কি আর তুমি জান না!

স্বামী গম্ভীরভাবে বল্লেন—ঠিক! ঠিক বলেছ, আমারই অন্যায় হয়েছে।

সেবার শহরে ফিরে গিয়েই বোধহয় সপ্তাহখানেক পরে তিনি আমায় পঁচিশটে টাকা পাঠিয়ে দিলেন। আবার কিছুদিন দু-বেলা খাওয়া চল্‌ল।

প্রায় বছরখানেক ধরে সেবার আমরা বেশ সুখেই কাটিয়েছিলুম। স্বামীর উপরি-আয়ও বেশ হচ্ছিল, আমরা প্রায় শ'দেড়েক টাকা জমিয়ে খানিকটা ধানের জমিও নিলুম। নিজেদের দেখবার সময় নেই বলে সে জমিটাও ভাগে দেওয়া হোলো। দীনুকে পাঠশালায় দেওয়া হোলো, সে পুঁথি পাততাড়ি নিয়ে সকাল-সন্ধ্যে পাঠশালায় যেতে লাগ্‌ল। আমি মনে করলুম, ভগবান বোধ হয় এবার মুখ তুলে চাইলেন।

সেবার পুজোর বোধহয় মাসখানেক আগে একদিন অচ্যুত কাকার ছেলে দুপুরবেলা এসে বল্লে—বৌ, আমি আজই শহরে যাচ্ছি, চিঠি এসেছে তাদের ভারী বিপদ, শীগ্‌গীর কিছু টাকার জোগাড় কোরে নিয়ে আমায় আস্‌তে লিখেছে।

মাথায় যেন বজ্রাঘাত হোলো। বিপদ! কি বিপদ!

—তা তো কিছু লেখেনি, কিছু বুঝতেও পারছি না।

আমার কাছে তেরোটা টাকা ছিল, তা থেকে তিনটে রেখে দিয়ে দশটা টাকা আনন্দর হাতে দিয়ে বল্লুম—কি কোরে খবর পাব?

আনন্দ বল্লে—আমি যত শীগ্‌গীর পারি ফিরে আসব, তুমি কিন্তু আমি না আসা পর্য্যন্ত কারো কাছে কিছু ভেঙো-না।

আনন্দ সেইদিনই সন্ধ্যের সময় গরুর গাড়ী কোরে শহরে

চলে গেল। দু-এক জন তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বল্লে—শহরে বীজ কিন্‌তে যাচ্ছি।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ীর ভেতরে গিয়ে বসলুম। দীনু এসে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমার খেতে-শুতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। বিপদ! কি বিপদ! আমার সর্ব্বনাশ হোলো না তো! না না, তা হোলে অচ্যুত কাকা সে কথা লিখেই জানাতে পারত, আমার জন্য ছেলেকে সেখানে ডাকিয়ে পাঠাবে কেন? গরীব সে, পরের জন্য কেন অত পয়সা খরচ করবে?

চার রাত, চার দিন কেটে গেল, আনন্দ ফিরল না। আমার এক-একবার মনে হোতে লাগল যে, একাই শহরে চলে যাই। সেই তিনটে টাকা তো কাছেই রয়েছে। কিন্তু ছেলেকে কোথায় রাখব! নানা দিক বিচার কোরে কি যে করব কিছুই ঠিক করতে পারছি না, এমন সময় একদিন আনন্দ এসে হাজির হোলো।

আনন্দ যে ফিরে এসেছে সে কথা আমি আগে টের পাই-নি। সন্ধ্যের পর সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। মুখটি শুকিয়ে এসে সে বল্লে—বৌ, সর্ব্বনাশ হয়েছে!

—কি হয়েছে?

—বাবা আর নটবর-দাকে পুলিশে গ্রেপ্তার করেছে। তারা নাকি ঘুষ নিয়েছিল!

—এ্যাঁ!!!

—আদালতে যারা কাজ করে, তারা সকলেই এদিক-ওদিক

দু-এক আনা ঘুষ নেয়। এ এক কড়া হাকিম এসে তকে তকে থেকে তিন চার জনকে ধরেছে।

—তবে উপায়!

—উপায় তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এই চারদিন ধরে কত চেষ্টা করলুম, তাদের জামিনই দিলে না। বল্লে—চুরির আসামীর জামিন নেই, জেল নাকি একেবারে নির্ঘাস! ভারী কড়া হাকিম!

আমি চীৎকার কোরে কেঁদে উঠলুম—ওগো আমার কি হোলো গো!

আনন্দ বল্লে—চুপ কর বৌ, আর এ-সময় কেঁদে-কেটে একটা অনর্থ বাধিও না। কান্নাকাটি করলে গাঁয়ের সব লোক টের পেয়ে যাবে। শেষে আমাদের মুখ দেখানো দায় হোয়ে উঠ্‌বে। আমি গাঁয়ে রটিয়ে দেব যে, বাবা আর নটবর-দাকে অন্য এক জেলা আদালতে বদলী কোরে দেওয়া হয়েছে বলে তারা এবারকার ছুটিতে আস্‌তে পারলে না। ক-মাসই বা সাজা হবে। বড় জোর মাস ছয়েক!

আনন্দ যাবার সময় বলে গেল, দিন পনেরো পরে তাদের মামলা উঠ্‌বে, সেই সময় সে আবার শহরে যাবে।

দেখতে-দেখতে পনেরো দিন কেটে গেল। আনন্দ সেদিন সন্ধ্যাবেলা শহরে রওনা হোলো। সে বল্লে—আজ সারা রাত লাগ্‌বে শহরে পৌছতে; কাল মামলার দিন। কাল আদালতের কাজ শেষ হোয়ে ছুটি হবে।

আমি দু-দিন উপোস মানৎ করেছিলুম। দু-দিন দু-রাত্রি মা দুর্গার কাছে নিয়ত মাথা খুঁড়েছি। বলেছি, তুমি দেশের চারদিকে আনন্দের সাড়া জাগিয়ে দিয়ে আস্‌ছ, দেখো মা এ দারিদ্র্যকে যেন ভুলো না।

দু-দিন বাদে আনন্দ ফিরে এসে বল্লে—সাজা হোয়ে গেল। উকীল কত বোঝালে, হাকিম কিছুতেই শুন্‌লে না। বাবার দেড় বছর, নটবর-দার এক বছর!

মা জগৎ-জননী! আমার কপালে কি এই লিখেছিলে! এ দুখিনীর প্রতি দয়া হোলো না।

সকাল বেলা সানাইয়ের সুর কানে এসে লাগ্‌তে লাগ্‌ল—সারা বরষ দেখি-নি মা—

আমি চুপ কোরে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলুম—। আনন্দ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ী চলে গেল। একবার ইচ্ছে হোলো প্রাণ খুলে চেঁচিয়ে কাঁদি, কিন্তু তারও উপায় নেই। লোকনিন্দা! সকলে চেঁচিয়ে বল্‌বে—নটবরটা শেষে জেল খাট্‌লে!

সকালবেলা দীননাথ পূজো-বাড়ীতে গিয়েছে, সে একেবারে সেখান থেকে খেয়ে আস্‌বে। আমি আর উনুনে আগুণ দিলুম না। আমার শরীর এলিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, যেখানে বসেছিলুম সেইখানেই ঢলে পড়লুম।

দীননাথ পূজো-বাড়ী থেকে ফিরে এসে বল্লে—হ্যাঁ মা আমায় নতুন কাপড় দিবি-নে।

ইচ্ছে হোলো, উঠে তাকে কিলিয়ে নতুন কাপড়-পরা বের কোরে দিই। কিন্তু তখুনি মনে হোলো—আহা! রোগা ছেলে আমার!

দীনু আরও কত কি কথা বলে আমার জবাব না পেয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে গেল।

বাড়ীর পাশ দিয়ে সমস্ত দিন ধরে কত স্ত্রী পুরুষ আনা-গোনা করতে লাগল। তাদের উল্লাস, তাদের হাসি আমার কানে এসে লাগ্‌ছিল। সবার মুখেই এক কথা! মা এসেছে! এবার মা বসুন্ধরাকে ধন-ধান্যে পূর্ণ কোরে দিয়ে যাবে। আমি পড়ে ভাবছিলুম—সবারই মা এল, কিন্তু সে আমার মা নয়। ধন-ধান্যে বসুন্ধরা পূর্ণ হোয়ে গেলেও আমার যে দুঃখু তার তিলমাত্রও কম্‌বে না।

শুয়ে-শুয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম টের পাই-নি, যখন ঘুম ভাঙল, তখন গভীর রাত্রি। পূজো-বাড়ীর বাজনা থেমে গেছে, রাত্রি ঝাঁ-ঝাঁ করছে। ঘুম ভাঙতেই ডাক দিলুম—দীনু, দীনু—ও বাবা দীননাথ!

তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে পিদ্দিম জেলে বাইরে এনে দেখি আমি যেখানে শুয়েছিলুম তারই কাছে দীনু হাতের ওপর মাথা রেখে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

দীনুকে তুলে নিয়ে ঘরে শুইয়ে দিলুম। ক্ষিধেয় নাড়ীর ভেতরে পাক দিচ্ছিল, তিনদিন জল ছাড়া কিছু খাই-নি। দুদিন উপোষ মানৎ করেছিলুম, কিন্তু ভগবান তো মুখ তুলে চাইলে

না। ঘরে মুড়ি ছিল, তাই চাট্টি বের কোরে এনে চিবিয়ে শুয়ে পড়্লুম।

সারাদিন ঘুমিয়ে কেটেছে, রাত্রে আর ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছিল, স্বামীর জেল হওয়ার জন্য কি আমিই দায়ী? শহরে যাবার জন্য আমিই তো তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলুম। ওগো, উপরি-পাওনা মানে চুরি, তা জান্লে কি যেতে দিতুম! চাষা আমরা গরীবই থাকতুম; আমাদের অত টাকা দিয়ে কি হবে? সেবার স্বামীকে যে অভিমানের কথাগুলো বলেছিলুম তাও মনে পড়্তে লাগ্ল। আমার জন্যই কি বেশী কোরে চুরি করতে গিয়ে তিনি ধরা-পড়্লেন। হায়! এমন কোরে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছি। স্বামীকে চোর করেছি, তাঁকে জেলে পাঠিয়েছি, আমার পাপের আর অন্ত নেই। জেলের মধ্যে সেই ভীষণ খাটুনী কি তিনি সহ্য করতে পারবেন! সেখানে নাকি উঠ্তে বস্তে চাবুক মারে! ঐ রোগা শরীরে কত সহ্য হবে, যদি শক্ত রোগ হয় তবুও কি তারা ছাড়্বে না! এক বছর! এক বছর আমার কি কোরে কাট্বে, আমি কেমন কোরে কাটাব!

পুজো কেটে গেল! দীনু দিনকয়েক নতুন কাপড়ের জন্য গোলমাল করলে। নতুন কাপড় আমি কোথায় পাব? দীনু বল্লে—বাবা এল না কেন?

আমি বল্লুম—তোর বাবা বিদেশে গেছে।

সে তাই শুনে চুপ কোরে রইল।

গ্রামের লোকেরা জান্‌ত যে, আমার স্বামী বিদেশে বদ্‌লী হোয়ে গেছেন। তবুও আমি গ্রামের কারো সামনে বেরুতে পারতুম না। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তা হোলে হয়তো আমার মুখ দেখেই সব কথা জানতে পারবে। দিনের বেলা আমি বাড়ী থেকে বেরুতুমই না। রাত্রে পুকুর থেকে খাবার জল তুলে নিয়ে আসতুম, বাড়ীতে আমাদের কিছু ধান মজুদ করা ছিল, তা দিয়ে কিছুদিন চল্‌ল, তারপরে আনন্দকে মার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে দু'এক টাকা ভিক্ষে কোরে আন্‌তুম। আবার এক বেলা খাওয়া সুরু হোলো, দু-বেলা পেট ভরে খাওয়া ভগবান আমার ভাগ্যে লেখে-নি।

একদিন সন্ধ্যেবেলা দীনু পায়ে চোট্ লাগিয়ে পাঠশালা থেকে ফিরে এল। সে দাঁড়াতে পাচ্ছিল না, শুয়ে পড়্‌ল। আমি তখুনি চূণ-হলুদ গরম কোরে তার পায়ে লাগিয়ে দিলুম। একেই ছেলে আমার রোগা, সে ব্যথায় কাৎরাতে লাগ্‌ল। ঘণ্টা দুয়েক ছট্‌ফট্ কোরে দীনু ঘুমিয়ে পড়্‌ল, আমি তাকে খাবার জন্য না জাগিয়েই শুয়ে রইলুম। অনেক রাতে দীনু জেগে বল্লে—মা জল খাব।

অন্ধকারেই তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—কিছু খাবি-নি?

দীনু বল্লে—না, তুই জল দে।

বাতি জ্বেলে তাকে জল দিতে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখি জ্বরে একেবারে তার গা পুড়ে যাচ্ছে। সারারাত সে জ্বরে ছট্‌ফট করলে। সকালবেলা আমি আনন্দকে ডাকিয়ে দীনুর জ্বরের কথা

বল্লুম। সে ছুটে কবরেজের বাড়ী গেল, আমার কাছে পয়সা ছিল না, ধারেই ওষুধ এল।

ওষুধের গুণে কিনা জানি না, দিন কয়েকের মধ্যেই দীনু সেরে উঠ্‌ল, কিন্তু কয়েকদিন পরেই আবার একদিন পাঠশালা থেকে জ্বর নিয়ে ফিরে এল। শীতের সময় প্রত্যেক বছরেই সে জ্বরে পড়ে, সেজন্য এবারও আমি ততটা ভাবি-নি। একদিন দু-দিন কোরে প্রায় মাসাবধি তার জ্বর সমানভাবেই রইল। একদিন আমি তাকে কোলে কোরে কবরেজের বাড়ী নিয়ে গেলুম; কবরেজ-মশায় বড়ী দিলেন, কিন্তু তাঁর ওষুধে সেবার কিছু হোলো না। ছেলে আমার দিনে-দিনে বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে যেতে লাগ্‌ল। ক্রমে তার উত্থানশক্তি রহিত হোয়ে গেল।

আনন্দ বল্লে—কলকাতায় ভাল ওষুধ পাওয়া যায়।

আমি মার কাছ থেকে টাকা আনিয়ে আনন্দকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলুম। সেখান থেকে ওষুধ এল, দীনুকে খাওয়ালুম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না। ছেলে আমার আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগ্‌ল।

ছেলে যে আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে আমি হতভাগী কি তা বুঝতে পেরেছিলুম! কোন্ মা আর বিশ্বাস করতে পারে যে, তার ছেলে তাকে ছেড়ে চলে যাবে। বাবা দীনু, সে যে আমার শিবরাত্রির সল্‌তে। আমার চারিদিক অন্ধকারে ঘিরে এসেছিল, সেই অন্ধকারের মধ্যে দীনুই যে আমার ধ্রুবতারা,

তাকে নিয়ে আমি সমস্ত দুঃখ অম্লানবদনে সহ্য কোরে চলেছিলুম। শুধু আমার নয়, আমাদের সেই অশান্তিময় সংসারে সেই যে শান্তি এনেছিল। এইটুকু জীবন তার, সংসারের এক কোনে কোনো রকমে টিপ্ টিপ্ কোরে জল্‌ছে, সেই প্রদীপটুকু নিবিয়ে দেবার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা হাত তুলে বসে আছেন, এ অভাগিনী তা একেবারেই বুঝতে পারে-নি।

আনন্দ বেচারী নিজের কাজকর্ম্ম সেরে রোজ একবার আমাদের বাড়ীতে এসে দীনুকে দেখে যেত। দীনুর কাছে বসে থাকা ছাড়া আমার আর অন্য কাজ কিছু ছিল না। দীনুর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হোতে লাগ্‌ল, সেবার আমি ভয়ে ঠাকুর-দেবতার কাছে কোনো মানৎ করি-নি। দেবতার কাছে মানৎ করতে আমার ভয় হোতো, কারণ আজ পর্য্যন্ত যতবার করেছি—একবারও দেবতা আমার কথা শোনে-নি। দীনু ক্রমে কথাবার্ত্তা বলা বন্ধ কোরে দিলে। সমস্ত দিন-রাতের মধ্যে একটা কি দুটো কথা বল্‌ত মাত্র। তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল হোয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কিছু দরকার হোলে সেই জ্বল্‌জ্বলে চোখ দুটো তুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকৃত।

একদিন রাতে, সেদিন অমাবস্যা। আমার ঘরের কোনে একটা প্রদীপ টিম্ টিম্ কোরে জ্বল্‌ছে। বাইরে ঝড় বাতাসে গাছপালাগুলো চীৎকার করছে, রাত তখন তিন প্রহর হবে, সারারাত দীনুর মাথার শিয়রে বসে আছি, হঠাৎ সে চোখ

চেয়ে বল্লে—মা বাবা এল না, আমার নতুন কাপড় আন্‌বে না?

আমি হেঁট হোয়ে তাকে বল্লুম—তুমি সেরে ওঠ বাবা, তোমায় আমি চারখানা নতুন কাপড় দেব।

আমার চোখে জল ছিল, মাথা নীচু কোরে তার সঙ্গে কথা বল্‌তে গিয়ে এক ফোঁটা জল বোধহয় তার মুখের ওপর গিয়ে পড়েছিল। দীনু বল্লে—কাঁদিস্‌-নি মা, আমি শীগ্‌গীর সেরে উঠ্‌ব।

এই কথা বলে দীনু চুপ করলে। তারই কিছুক্ষণ পরে তার হেঁচ্‌কি উঠ্‌তে আরম্ভ করল। এর আগেও মাঝে-মাঝে ঐ রকম হয়েছিল, তাই আমি তার মুখে একটু জল দিলুম। সারারাত এম্‌নি কাট্‌ল।

সকালবেলা দীনু বল্লে—আমায় একটু গুড় দেনা মা।

আমার ঘরে গুড় ছিল না, আমি ছুট্‌লুম মুদীর দোকানে, সেখান থেকে একটু গুড় চেয়ে আনবার জন্য। ছুট্‌তে ছুট্‌তে ফিরে এসে দেখি দীনুর চোখ উল্টে গিয়েছে আর আনন্দ তার মুখে জল দিচ্ছে। তার মুখ দেখেই আমার অন্তরাত্মা হাজার কণ্ঠে ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—দেখ, তোর সর্ব্বনাশ হোয়ে গেল!

আমি ঘুরে মাটিতে পড়ে গেলুম।

আনন্দ লোকজন জোগাড় কোরে নিয়ে এল। গাঁয়ের অনেক মেয়েছেলে আমার বাড়ীতে এসে আমায় বোঝাতে লাগল, সংসারে থাকতে গেলেই এ সব হয়। আমার কাছে একটি পয়সাও ছিল না, দীনুকে দাহ করবার খরচ কোথা থেকে পাব? হারছড়া অনেকদিন আগেই বিক্রি হয়েছে। একজোড়া বালা ছিল তা বিক্রি কোরে কবরেজের পেট ভরিয়েছি। আমার একটা নথ ছিল, ঘরকরা সেই লক্ষ্মীটুকু বের কোরে এনে আনন্দের হাতে দিলুম। আনন্দ কোথায়

সেটা বেচ্‌লে জানি না। একজন দয়া কোরে আমার মার কাছে খবর দিতে চলে গেল।

গাঁয়ের চার-পাঁচটি ছেলে মিলে দীনুর দেহ বয়ে নিয়ে চল্‌ল। শ্মশান আমাদের গাঁ থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে, আমাকেও তাদের সঙ্গে চল্‌তে হোলো। আমার সঙ্গে আনন্দর মাও চল্‌ল। আনন্দদের ঋণ আমি কখনো পরিশোধ করতে পারব না। তারা চিরকাল আমাদের প্রাণপণে উপকার করেছে, বিনিময়ে কখনো কিছু প্রত্যাশা করে-নি। তাদের অবস্থা আমাদের চেয়ে যে বিশেষ ভাল ছিল তা নয়, তবুও তারা আমাকে অর্থ সাহায্য পর্য্যন্ত করেছে, সে সব অর্থ আমি ধার বলে তাদের কাছ থেকে নিলেও কখনো তারা সেজন্য তাগাদা করে-নি। আমার সৌভাগ্য যে, আমি তাদের সমস্ত দেনাই শোধ কোরে দিতে পেরেছি।

সমস্ত দিন পরে কাঁদ্‌তে-কাঁদ্‌তে যখন শ্মশান থেকে বাড়ী ফিরলুম, তখন সূর্য, পশ্চিম-আকাশে ঢলে পড়েছে। আমরা ফেরবার আগেই মা আমাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়েছিল! মা আমাকে দেখেই চীৎকার কোরে কেঁদে উঠ্‌ল—রাক্ষুসী, ছেলেটাকে খেয়ে তবে ছাড়্‌লি! কতবার তোকে না বলেছি দীনুকে আমার কাছে রেখে দে!

আমি মাকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগলুম—মা মা আমি রাক্ষুসী, আমায় তোরা মেরে ফেল্‌, দীনুকে ছেড়ে আমি কি কোরে থাক্‌ব।

সেখানে পাড়ার আরও অনেক গিন্নি উপস্থিত ছিলেন। তারা নানা জনে নানান কথা বল্‌তে লাগ্‌ল। কেউ-কেউ দীনুর বাবার নাম উল্লেখ কোরে বল্লে—ছেলেটা এসে যখন ঘর খালি দেখবে তখন কি আর বাঁচ্‌বে ?

কেউ বা বল্লে—বৌটার মুখে একটু জল দাও, আজ কদিন খায়-নি তার ঠিকানা নেই।

রাত্রি হোতে সবাই চলে গেল। আমার মা আমায় এক ঘটি গুড়ের সরবৎ তৈরি কোরে খাইয়ে দিলে। তারপর আমি মাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলুম।

মা মা মা! তোমাতে এত অভয় এত সান্ত্বনা মাখান আছে, এমন কোরে তো কোনো দিনই তা অনুভব করি-নি। এই মাকে আমি কত গালাগালি দিয়েছি! আমার মনে হোতে লাগল, আবার আমার ছেলেবেলা ফিরে এসেছে। আমি আমাদের সেই ঘরে মাকে জড়িয়ে শুয়ে আছি। ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, অনাহার, দুশ্চিন্তা, নিন্দার ভয় কিছুই নাই। চারিদিক হোতে অজস্র দানে আমার প্রয়োজনের পাত্র সর্ব্বদাই পূর্ণ হোয়ে আছে। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলুম, সুদাম আমায় বাইরে থেকে ডাক দিচ্ছে, কিন্তু সুদাম জানে না যে, আজ আর আমি কিছুতেই যাব না। ভুল অনেক করেছি, কিন্তু এতদিন যে মাকে চিন্‌তে পারি-নি। সুদাম ডেকে-ডেকে ফিরে গেল। আমি শুয়ে-শুয়ে হাসতে লাগ্‌লুম। হঠাৎ একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর যেন দূর থেকে বাতাসে ভেসে এসে কানে বাজ্‌ল। কার এ কণ্ঠস্বর! এ যে

আমার চির পরিচিত! নিকটে আরও নিকটে—একেবারে আমার কানের কাছে! সেই কণ্ঠস্বর—মা মা!

ভুলে গেলুম, সব ভুলে গেলুম। আমার বাল্যকাল, আমার মা এক মুহূর্ত্তে আমার কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। আমি চীৎকার কোরে বলে উঠ্‌লুম— কি বাবা? এই যে আমি!

—একটু গুড় দেনা মা!

ধড়্‌মড়্‌ কোরে উঠে বস্‌লুম! কিন্তু কোথায় কে? মা ঘরের মধ্যে পিদ্দীম জ্বালিয়ে রেখেছিল, আমায় এম্‌নি কোরে উঠ্‌তে দেখে মা বল্লে অমন্ কচ্ছিস্ কেন মা?

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লুম—মা মা দীনু এসেছিল, আমি তার ডাক শুনেছি; আমাদের ঘুমুতে দেখে সে ফিরে গেল।

আমার কথা শুনে মা আমায় সান্ত্বনা দিতে লাগ্‌ল। আমি মার আঁচলে মুখ লুকিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লুম। দীনুর কণ্ঠস্বর তখনো আমার কানে লেগে রয়েছে। কাঁদ্‌তে-কাঁদ্‌তে আমি তাকে মিনতি কোরে বল্লুম—দীনু, মাণিক আমার, এ অভাগী মাকে এমন কোরে আর ডাক দিস্‌নে বাবা। তুই যেখানে গিয়েছিস্ সেখানে তোর খেলার সঙ্গীর অভাব হবে না। এখানে এখন আর আসিস্ না, তোর এই দুঃখিনি মা যেদিন তোর কাছে যাবার জন্য তৈরি হবে, সেই দিন আমাকে নিতে আসিস্।

আমি আবার শুয়ে পড়লুম! মা বল্লে—সৈরি আর ঘুমোস্‌নি, আজকে জেগে থাক্‌তে হয়।

মার কথা শুনে আমি উঠে মুখ ধুয়ে বসে রইলুম। রাত প্রায় পুইয়ে এসেছিল, দেখতে-দেখতে ফর্শা হোয়ে গেল।

এক দিন দু-দিন কোরে এক মাস কেটে গেল। আবার সংসারের কাজ কর্ম্ম করতে আরম্ভ করলুম। দীনুকে ছেড়ে কোনো দিন সংসার করতে হবে এ কথা কখনো কল্পনাতেও আসেনি, তাকে ছেড়ে বাঁচব কি না তাও কখনো চিন্তা করি-নি। বুকের মধ্যে তুষের আগুন নিয়ে আবার নাওয়া-খাওয়া জল তোলা সবই করতে লাগলুম।

আনন্দ মাঝে-মাঝে জেলে তার বাপকে দেখতে যেতো। মাসে একদিন কোরে সেখানে কয়েদীদের দেখা করবার দিন। আমি স্থির করলুম যে, এবারে আনন্দ যখন তার বাপকে দেখতে যাবে আমিও তার সঙ্গে যাব। দীনুর মৃত্যুর খবরটা আমিই তাঁকে দেব। কিন্তু মা তখনো আমার কাছে; মা জানে যে, তার জামাই বিদেশে চাকরী করে বলে আসতে পারে না। এ কথা আমি নিজেই মাকে অনেক দিন আগে একবার বলেছি, এখন আনন্দের সঙ্গে শহরে যেতে চাইলে মা-ই বা কি মনে করবে। অথচ স্বামীকে দেখবার জন্য আমার মন বড় আকুল হোয়ে উঠতে লাগল। ভেবে-চিন্তে কিছুই যখন কিনারা করতে পারছি না, তখন একদিন অত্যন্ত আকস্মিক-ভাবে আমার শহরে যাওয়াটা সহজ হোয়ে উঠল।

একদিন রাত্রিবেলা আমি আর মা ঘরে বসে গল্প করছি। বাতিটা নেবান রয়েছে। আমি আমার দুঃখের কাহিনী মাকে

বলে যাচ্ছিলুম। কতদিন না খেয়ে কাটিয়েছি, দীনুর জন্য কত মানৎ করেছি। আমার হার, বালা ও শেষকালে নথটা পর্য্যন্ত কেমন ক'রে বিক্রি হোয়ে গেল।

মা আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বল্লে—আমি তোকে আবার হার, বালা, নথ গড়িয়ে দেব।

মার কাছে আমি যেন সেই ছোট্ট সৈরিই আছি। বুড়ো হোয়ে মরতে চল্লুম এখন আবার গয়না! চুপ কোরে এই সব কথা ভাবছি, হঠাৎ আমায় কিছু ভাববার অবসর না দিয়েই মা জিজ্ঞাসা কোরে ফেল্লে—হ্যাঁরে সৈরি! জামায়ের নাকি ফাটক হয়েছে?

আমি চুপ কোরে রইলুম। মা আবার বল্লে—বল্‌না পোড়ারমুখী, চুপ কোরে রইলি যে!

এবার আমি আর চুপ কোরে থাকতে পারলুম না। বলে ফেল্লুম—হ্যাঁ মা, তাঁর এক বছরের জেল হয়েছে, আর পাঁচ মাস বাদে খালাস পাবেন!

—তা হোলে যা শুনিছি তা সত্যি কথা!

আমি যা জানতুম সব মাকে খুলে বল্লুম। তাঁর এক বছর ও অচ্যুত কাকার দেড় বছর।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কিন্তু তুমি এ কথা জান্‌লে কি কোরে? এ গাঁয়ে তো সে কথা কেউ জানে না।

মা বল্লে—এ কথা আমি ঘরে বসেই শুনেছি। ওদের সঙ্গে আমাদের নীলু ঠাকুরপোর ছেলেও ধরা পড়েছিল কি না!

আমাদের সুদাম যে তার মামলার তদ্বির করত। সেই তো এসে বল্লে, মাসী তোমার জামাইও আসামী হয়েছে!

আবার সুদাম! আমি মাকে বল্লুম—কি হবে, মা, কি হবে?

মা কোনো কথা না বলে আমায় জড়িয়ে ধরলে। আমি মার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগলুম। কতক্ষণ সেইভাবে কেঁদেছিলুম জানি না। আমার মনে হোতে লাগ্‌ল, ঘরের অন্ধকার যেন ধীরে-ধীরে মমতায় পূর্ণ হোয়ে উঠ্‌ল। বুকের মধ্যে বল পেতে লাগলুম, কে যেন ভেতর থেকে বলতে লাগ্‌ল—তোর সব দুঃখ চলে যাবে, এ মেঘ কেটে যাবে।

অনেকক্ষণ পরে মা বল্লে—যা হবার তাতো হোয়ে গেছে বাছা, এখন হাজার চেষ্টা করলেও তো তাঁকে সেখান থেকে বের করা যাবে না। এখন চল আমার ওখানে, তোমায় আর শ্বশুর-ঘর করতে হবে না।

যাব মা যাব, কিন্তু, যাবার আগে একবার তাঁকে দেখে যাব।

মা বল্লেন—সে ফিরে একেবারে আমাদের ওখানে গিয়েই উঠ্‌বে, তুই কি মনে করেছিস্ এখানে সে আর মুখ দেখাতে পারবে।

আমি বল্লুম—দীনু যে চলে গেছে এ খবরটা তাঁকে আমি না দিয়ে যে যেতে পারব না মা।

মা আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরে বল্লে—কি কোরে সেখানে যাবি? সেখানে তোকে দেখতে যেতে দেবেই বা কেন?

আমি আশ্বস্ত হোয়ে বল্লুম—সে ব্যবস্থা আমি ঠিক কোরে নিচ্ছি।

পরদিন আনন্দকে ডেকে বল্লুম—আমি জেলে গিয়ে একবার আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চাই, সব বন্দোবস্ত কর।

আনন্দ বল্লে—আসছে শুক্রবার দেখা করবার দিন আছে, তা হোলে চল বেরিয়ে পড়া যাক।

আমি বল্লুম—আচ্ছা।

পরের সপ্তাহে মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় আমি, আনন্দ আর মা গরুর গাড়ী কোরে শহরে রওনা হলুম। মাকে সঙ্গে নিতে হোলো, কারণ আনন্দের সঙ্গে একলা শহরে গেলে নানা কথা উঠতে পারে। শহরে গিয়ে একটা মুদীর দোকানে আমরা ঘর ভাড়া করলুম। একটা দিন কোনো রকমে কেটে গেল। শুক্রবার সকালবেলা আমি আর আনন্দ জেলখানার ফটকের কাছে গিয়ে দাড়ালুম। মাকে সঙ্গে আনি-নি, কারণ মাকে দেখলে আমার স্বামী যে অত্যন্ত লজ্জা পাবেন তা আমার জানা ছিল।

জেলে ঢোকবার আগে হুকুম পাশ করিয়ে নিতে হোলো। সে সব কাজ আমার হোয়ে আনন্দই করলে। হুকুম পাশ হোয়ে যাওয়ার পর জেলের দরজা খুলে আমাদের ভেতর নিয়ে যাওয়া হোলো। তারপর আর একটা বড় লোহার রেলিং দেওয়া দরজার সামনে গিয়ে আমরা দাঁড়ালুম। আমাদের মত আরও অনেক লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে বন্দুক হাতে একজন সেপাই দাঁড়িয়ে। তাকে দেখেই তো আমার আত্মাপুরুষ

চম্‌কে উঠ্‌ল। আমি এতটা বড় হয়েছি কিন্তু সেপাই কখনো দেখি-নি। দরজার ধারে আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। শুনলুম, এই দরজার ব্যবধান ঘুচ্‌বে না, কয়েদীরা ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকে, আর তাদের আত্মীয়-স্বজনদের এপাশে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌তে হয়। এত লোকের সাম্‌নে স্বামীর সঙ্গে কথাই বা বলব কি কোরে তাই ভাবতে লাগলুম।

বোধ হয় ঘণ্টা দুয়েক দাঁড়িয়ে থাকার পর ঝন্‌ঝন্‌ কোরে আওয়াজ হোয়ে আমাদের দরজার সামনা-সাম্‌নি ঠিক সেই রকমের আর একটা লোহার দরজা খুলে গেল। আর সেই রকম বন্দুকধারী একজন সেপাইর সঙ্গে কয়েকজন কয়েদী ঘরের ভেতরে ঢুক্‌ল।

কয়েদীদের মধ্যে অচ্যুত কাকা ও আমার স্বামী ছিলেন। ছোট-ছোট কোর্ত্তা ও হাঁটুর ওপর অবধি পা-জামা পরা। আমার স্বামী আমাকে দেখে চম্‌কে উঠ্‌লেন। লোহার রেলিংটা ধরে আমায় খুব আস্তে-আস্তে বল্লেন—তুমি কেন কষ্ট কোরে এলে?

আমি বল্লুম—আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে?

স্বামী ছট্‌ফট্‌ করতে-করতে বলে ফেল্লেন—কেন কেন কি হয়েছে! দীনু ভাল আছে তো?

আমি বল্লুম—দীনু আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, কিছুতেই তাকে রাখতে পারলুম না।

—এঁ্যা—বলে রেলিং ধরে তিনি বসে পড়লেন।

অনেকক্ষণ ঘাড় নীচু কোরে সেইভাবে বসে থেকে, আস্তে আস্তে উঠে তিনি আমায় বল্লেন—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। তুমি আর কি করবে বল!

আমার মুখে আর কোনো-কথা যোগাচ্ছিল না। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। দেখলুম, তাঁর বিষণ্ণ মুখ আরও বিষণ্ণ হোয়ে গিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কেমন আছ? কিছু খেতে ইচ্ছে হয়?

আমার কথার উত্তরে একটি ছোট্ট—না—বলে তিনি চুপ কোরে রইলেন। একটু পরে সময় হোয়ে গিয়েছে বলে সেপাই সেই দরজাটা খুলে তাঁদের ওপারে নিয়ে গেল। প্রায় এক বছর পরে স্বামীকে দেখে জেল থেকে বেরিয়ে এলুম।

আমরা সেই দিনই শহর থেকে গ্রামে চলে এলুম। স্বামীর সেই বিষণ্ণ মুখখানা সর্ব্বদা আমার চোখের ওপর ভাসতে লাগল। পুত্রশোকে সান্ত্বনা দেবার সেখানে কে আছে? একবিন্দু চোখের ফেলবারও উপায় নেই। আমার সঙ্গে মা আছেন, কিন্তু তাঁর কে আছে? আমার শ্বশুর চাষা ছিলেন বটে, কিন্তু পয়সা হওয়ায় তিনি তাঁর বাড়ীর হালচাল কোরে ফেলেছিলেন একেবারে ভদ্রলোকের মত। আমার স্বামীর কথা শুনলে বুঝতে পারা যেত না, তিনি চাষার ছেলে। তাঁর

অদৃষ্টে চুরির দায়ে যে জেল-খাটা আছে এমন কথা কেউ কল্পনাও করে-নি। জেল হওয়ার অপমান তাঁর বুকে যে কি শেল বিঁধেছে সে কথা যারা তাঁকে জানে তারা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না। জেলে বসে হয়তো তিনি ভাবছিলেন যে, এই কষ্টের সময়টা পেরিয়ে গেলেই বাড়ীতে যাব, সেখানে আমার ছেলে আছে, ছেলের মুখ দেখে সব, কষ্ট ও অপমান ভুলব। আমি অভাগী তাঁর সেই সুখটুকুও ঘুচিয়ে দিলুম।

গরুর গাড়ীতে চড়ে সারারাত কাঁদ্‌তে-কাঁদ্‌তে বাড়ী ফিরলুম। দিন সাতেক এদিক-ওদিকে কেটে যাওয়ার পর একদিন মা বল্লেন—এবার চল্ বাড়ী যাই, জামাই এলে আবার আসবি।

পরের দিন বাড়ীর দরজায় তালা দিয়ে মার সঙ্গে বাপের বাড়ী ফিরে এলুম।

বোধ হয় দশ বছর পরে আবার বাপের বাড়ীতে ফিরে এলুম। জন্মভূমি! যেখানে আমার জীবনপদ্মের সমস্ত মধু নিংড়ে রেখে চলে গিয়েছিলুম, সেই জন্মভূমি! পুরুষের কাছে জন্মভূমি কি তা জানি না, কিন্তু নারীর কাছে জন্মভূমি যেন সোনার স্মৃতি-মন্দির। আমি যেন আবার আমার শৈশবে ফিরে এলুম। আমাদের গরুর গাড়ীটা আস্তে-আস্তে সেই জলার ধার দিয়ে সুদামদের ক্ষেতের বাঁক দিয়ে এগিয়ে চল্‌তে লাগল। এই জলার গল্প শুনতে-শুনতে কতদিন দীনু আমার গলা জড়িয়ে

ঘুমিয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছিল, এর সঙ্গে কি শুধু আমার দীনুর স্মৃতিই জড়িয়ে আছে! আর কি কিছু নাই!

বাড়ীতে এসে দিনকয়েক বাড়ী থেকে বেরুতে পারলুম না। আমার পুরোনো সঙ্গীনীদের মধ্যে তিনজন বিধবা হোয়ে ফিরে এসেছে, তারা বাপের বাড়ীতেই থাকে। একে-একে তাদের সঙ্গে দেখা হোলো। দেখলুম, বৈধব্য তাদের মুখের হাসি একেবারে মুছে ফেলতে পারে-নি, এক-একবার মনে হোতো জিজ্ঞাসা করি—হ্যাঁ ভাই, তোদের কি কোনো কষ্ট নাই? কিন্তু তা পারি-নি, হয়তো তারা সমস্ত দুঃখ মেনে নিয়েই হাসি ঠাট্টা আমোদ কোরে চলেছে, সংসারে থাকতে গেলে দুঃখু নিয়ে চিরকাল হাউ-হাউ কোরে বেড়ালে তো চলবে না?

আমাদের বাড়ীরও দেখলুম অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। মা অনেক জমি বাড়িয়েছেন, ঘরে দুটো-তিনটে ধানের গোলা ঠাসা ধান, তা ছাড়া প্রত্যেক বছরে ধান বিক্রি কোরে মার বেশ দু-পয়সা রোজগার হয়। মার নগদ টাকাও বেড়েছে। গাঁয়ের মধ্যে 'পয়সা আছে' বলে লোকে মার নাম করে। কিন্তু মার কত টাকা আছে, কোথায় টাকা আছে তা কোন দিনও আমি জিজ্ঞাসা করি-নি। টাকা দিয়ে আমি কি করব! টাকা আমার ছেলে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। টাকা আমার স্বামীকে জেল থেকে বার করতে পারবে না। অনাহার! অনাহার তো আমার সহই হোয়ে গেছে। শ্বশুরের মৃত্যুর পর খুব কম দিনই দু-বেলা পেট-ভরে খেয়েছি। মা মাঝে মাঝে

বল্‌তে বটে, জামাই এলে এবার এখানে এসেই থাক্‌তে বল, আমার এ সব কে দেখে? এতো তোদেরই জন্য।

সুদামের সঙ্গে দেখা হোলো। বেচারী সুদাম! একটি মেয়ে রেখে তার বৌটি মারা গেছে। মেয়েটী কোলে নিয়ে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সুন্দর ফুট্‌-ফুটে মেয়ে, চাষার ঘরে অমন মেয়ে দেখা যায় না। আমার কোলে মেয়েকে দিয়ে বল্লে—বল্‌ পিসিমা।

মা-মরা মেয়েটা আমার গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে—মা!

সুদাম বল্লে—তোর মা মরে গিয়েছে, ও পিসিমা।

মেয়েটা কিছুক্ষণ অবাক হোয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বল্লে—পিছিমা।

একবার ইচ্ছে হোলো সুদামকে বলি, তোর তো সংসারে কেউ নেই, মেয়েটাকে আমায় দিয়ে দে। কিন্তু সে কথা বল্‌তে বাধ-বাধ ঠেকল। আমি যে আমার ছেলেকে যমের হাতে দিয়ে এসেছি, সুদাম চাইলে আমি কি তাকে আমার ছেলে দিতে পারতুম!

দুদিন মেয়েটাকে আমার কাছে রেখে দিয়ে সুদাম আবার তাকে নিয়ে চলে গেল। সুদামকে দেখে মনে হোতো মেয়েটা যেন ওর প্রাণ।

মার কাছে প্রায় মাস চারেক কেটে গেল। আমার স্বামীর মুক্তির আর বেশী দেরী নেই; মার কাছে থাক্‌ব, না সেখানে চলে যাব এই ভাবছি, এমন সময় মা একদিন বল্লে—সুদামকে

তা হোলে জামাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিই! ও বলে আসুক একেবারে যেন সে এখানে চলে আসে।

আমি বল্লুম—না মা, সুদামকে পাঠিও না, আমি আনন্দকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে যা বল্‌বার বলে দিচ্ছি।

আনন্দকে ডেকে পাঠিয়ে আমার স্বামীকে সব কথা বল্‌তে বলে দিলুম।

আনন্দ ফিরে এসে বল্লে যে, তিনি আস্‌তে রাজী হয়েছেন। জেল থেকে বেরিয়ে সোজা এখানে চলে আস্‌বেন। অন্য সময় হোলে তিনি নিশ্চয় শ্বশুরবাড়ীতে এসে অন্নদাস হোয়ে থাকৃতে রাজী হতেন না। কিন্তু অবস্থার বিপর্য্যয়ে মানুষের মনও যে নীচু হোয়ে যায়। আমার স্বামী একদিন তাঁর শাশুড়ীর সামান্য সাহায্য নিতেও কুণ্ঠিত হয়েছিলেন; তখনো তাঁর অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু আত্মমর্য্যাদা ছিল। অবস্থার সঙ্গে-সঙ্গে আজ সেটুকুও ধূলিসাৎ হোয়ে গিয়েছে। স্বামী মার কাছে এসে থাকৃতে রাজী হয়েছেন শুনে আমার আনন্দ হয়েছিল এ-কথা অস্বীকার করব না, কিন্তু মনের নিভৃতকোণে তাঁর জন্য থেকে-থেকে একটুখানি দুঃখও জাগ্‌ছিল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দ আমাদের বাড়ীতে এসে পৌছল। আনন্দকে আমরা সেদিনটা ছাড়লুম না। পরের দিন সকালে আনন্দ চলে গেল। আমার বাপের বাড়ীর গাঁয়ে নীলু কাকার ছেলেও শহরে আদালতে কাজ করৃত! ঘুষ নেওয়ার দায়ে তার দু-বছর জেল হয়েছিল। আমার স্বামীর

যে জেল হয়েছিল তা গ্রামের মধ্যে সুদাম আর সে ছাড়া কেউ জান্‌ত না। সুদাম জেনেও গ্রামের কাউকে সে কথা বলে-নি।

এক বছর ধরে স্বামীকে কত কথা জিজ্ঞাসা করব বলে মনে-মনে ঠিক কোরে রেখেছিলুম, কিন্তু তাঁকে তো একটি কথাও জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না। ভেবেছিলুম, বল্‌ব যে, তোমার শেষকালে চুরি করবার প্রবৃত্তি হোলো? কিন্তু তাঁর বিষণ্ণ মুখ দেখে আমি সব ভুলে গেলুম। তাঁকে দেখেই মনে হোলো, আমার স্বামী, কত দুঃখুই না পেয়েছ তুমি।

যেদিন তিনি এলেন, সেদিন সমস্ত দিনটা তাঁর সঙ্গে সহজ-ভাবে কথাবার্তা বলবার পরে রাত্রিবেলা একলা কি রকম যেন বাধ-বাধ ঠেক্‌তে লাগ্‌ল; তিনি খেয়ে-দেয়ে চুপ কোরে শুয়েছিলেন, আমি পাশে বসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম। অনেকক্ষণ এইভাবে কাট্‌বার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—দীনু যাবার সময় আমার কথা কিছু বলে-নি?

—সে জিজ্ঞাসা করেছিল, বাবা এল না, আমার নতুন কাপড়—

আর কিছু বল্‌তে পারলুম না, কে যেন আমার গলা চেপে ধর্‌লে।

আমার স্বামীও কিছু বল্লেন না। কান্নার বেগটা থেমে গেলে আমি তাঁকে বল্লুম—বড় কষ্ট পেয়েছ তুমি না?

তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন—কষ্ট তুমিও তো

কিছু কম পাও-নি সৌরভ। যদি দীনুটা বেঁচে থাকত তো সব কষ্ট ভুলে থাকতে পারতুম।

তাঁর এ-সব কথার কোনো জবাব দিতে পারলুম না। মনে হোতে লাগল—আমার কষ্ট! কষ্ট সইতেই তো আমাদের জন্ম। আমরা যে মেয়েমানুষ। একে মেয়েমানুষ, তায় চাষার ঘরের মেয়ে!

সেদিন আর কিছু কথা হোলো না। গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। বহুদিন পরে বিছানায় শুতে পেয়ে বোধহয় আরামে ঘুমোচ্ছেন এই ভেবে আমিও আর কথাবার্ত্তা বলবার চেষ্টা করলুম না। তাঁর পাশে পড়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

আমার স্বামী আমাদের বাড়ীতেই রইলেন। মার কোথায় কোথায় জমি আছে; কোন-কোন জমি কাকে-কাকে কি হিসাবে ভাগে দেওয়া হয়েছে। কোন লোকটা ভাল, কোন লোকটা মাকে মেয়েমানুষ পেয়ে ঠকাবার চেষ্টা করে, —রোজ সকাল-সন্ধ্যায় মা বসে-বসে তাঁকে এই সব কথা বোঝাতেন। কোথায়-কোথায় মার টাকা খাটছে, কে এক বছরের সুদ ফেলে রেখেছে, তার জমি ক্রোক দিতে হবে, এ-সব পরামর্শও চলত। বছর দুয়েক ধরে বেশ চলল। স্বামী মাঝে-মাঝে তাঁর নিজের গ্রামে গিয়ে আমাদের যেটুকু জমি জমা অবশিষ্ট ছিল তার তদ্বির কোরে আসতেন, কিন্তু এ রকম আর বেশীদিন চলল না।

একদিন, স্বামী তাঁর গ্রাম থেকে ফিরে এসে আমায় বল্লেন —সৌরভ আমার আর এখানে থাকা পোষাচ্ছে না, আমি বাড়ী গিয়ে থাকৃব।

আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়্ল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম—কেন কি হয়েছে? মা কি তোমায় অপমান করেছে?

আমার মা মাঝে-মাঝে আমায় বড্ড গালাগালি দিত, আমার ভয় হোতো, পাছে মা কোনোদিন আমার শ্বশুর বাড়ী সম্বন্ধে খোঁটা দিয়ে ফেলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তা হোলে তিনি কখনো এ বাড়ীতে থাকবেন না; আমার অনুরোধেই তিনি এখানে থাকৃতে রাজী হয়েছিলেন। মা যদি কখনো তাঁকে কিছু বলেন তা হোলে আমার আর ক্ষোভের সীমা থাকবে না। আমার কথা শুনে তিনি জিভ্ কেটে বল্লেন —না না, তিনি কিছু বলেন-নি। বরং জেল-ফেরত জামাইকে তিনি যে আদর করেন তাতে আমিই লজ্জিত হোয়ে পড়ি।

স্বামীর এই কথায় যে আমি কি আশ্বস্ত হলুম তা আমি তোমাদের বুঝিয়ে বল্‌তে পারব না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম —তবে?

—তবে আর কি? আর কতদিন এখানে থাকৃব, ভাল দেখাচ্ছে না।

স্বামীর কথা শুনে মনটা আমার খারাপ হোয়ে গেল।

কিন্তু তখন সে সম্বন্ধে আর কোনো কথা হোলো না। রাত্রিবেলা কথায়-কথায় তিনি বলে ফেল্লেন যে, শ্বশুর

বাড়ীতে এইভাবে থাকার জন্য দেশে সবাই তাকে ভারি নিন্দে করছে। চাষার ছেলে, যখন হাত-পা ঠিক আছে তখন কেন শ্বশুরবাড়ীতে বসে খাব? স্বামী আমায় বল্লেন —তুমি এইখানেই থাক, আবার সেই সব কষ্ট তুমি সহ্য করতে পারবে না।

স্বামীর এই শেষ কথাগুলো শুনে আমার বড় অভিমান হোলো। একটা জবাবও মুখে এসেছিল, কিন্তু সাম্‌লে নিলুম। একবার অভিমান কোরে উত্তর দেওয়ায় যে সর্ব্বনাশ হয়েছিল সে কথা আমি কখনো ভুল্‌ব না। আমি তাঁর কথার কোনো জবাব না দিয়ে চুপ্ কোরে পড়ে-পড়ে ভাবতে লাগলুম— পুরুষ কি অদ্ভুত জীব! নিজের দুঃখু ও বিপদ টেনে আন্‌তে তাদের আর জুড়ি নাই।

স্বামীকে কদিন ধরে বোঝালুম, মার যা সম্পত্তি আছে সে তো আমাদেরই, আমরা যদি এখন থেকে এ-সব বুঝে সুঝে নিই তাতে নিন্দের কি আছে! আমরা সুখে-স্বচ্ছন্দে আছি, এইটে লোকের চোখে সইছে না, তাই তারা তোমাকে এই সব কথা বলেছে। স্বামী বল্লেন—তোমার মার বিষয় যখন আমাদের হাতে আস্‌বে তখন সে আলাদা কথা, তখনো নিজের দেশ ছেড়ে থাকা ঠিক হবে না।

আমি আবার তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলুম। বল্লুম—মার এই সব কাজ দেখবার জন্য তো একজন লোক চাই। তুমি যা কর, ধর তারই বদলে তুমি এখানে থাক।

আমার যুক্তিগুলো স্বামী মানলেন না, বরং আমার ওপর বিরক্ত হোয়ে বল্লেন—তুমি এখানে থাক, আমি না হয় মাঝে মাঝে এখানে আসব।

মাকে সব কথা খুলে বল্লুম। মা বল্লে,—তোমাদের কপালে দুঃখু আছে আমি কি করব বাছা ?

আমাদের যাবার কথা শুনে মা যে ভয়ানক রাগ করেছিল তা তার এই কয়টি কথায় প্রকাশ পেল। স্বামী দিনদুয়েক বাদে মাকে আমাদের যাবার কথা বল্লেন। মা বল্লে—তোমরা নিজেদের বাড়ীতে যাবে তার আর আমি কি বল্‌ব, যা ভাল বোঝ তাই কর।

মা তখন কিছু বল্লে না বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই নিজের মনে চেঁচিয়ে নানা কথা বল্‌তে লাগল। আমরা যাওয়া সম্বন্ধে ঘরের মধ্যে কি একটা পরামর্শ করছিলুম এমন সময়ে মার কথা কানে এল। মা বলছিল—এমন জামাই করেছিলুম যে, দু-বেলা মেয়েটা পেট ভরে খেতে পায়-না।

কথাটা আমার স্বামীর কানেও পৌঁচেছিল। দেখলুম, তাঁর মুখখানা একেবারে কালো হোয়ে উঠ্‌ল। আমি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মার মুখ চেপে ধরে বল্লুম—তোর পায়ে পড়ি মা, আগে আমরা বেরিয়ে যাই, তারপরে তুই যত খুসী চেঁচাস্।

হয়তো আমাদের আরও দুই একদিন থাকা হোতো, কিন্তু সেইদিনই সন্ধ্যার সময় আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

প্রায় তিন বছর পরে আবার শ্বশুরবাড়ী ফিরে এলুম। বাড়ী তৈরী হওয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত একবারও ঘর ছাওয়া হয়-নি। এসে দেখলুম ছাউনি পচে গেছে, নীচু ঘরগুলোর ছাউনি থেকে গরুতে খড় টেনে নিয়েছে। আমার স্বামীর জমি-জমা থেকে যা কিছু সামান্য আয় ছিল, এই তিন বছর ধরে তিনি তার প্রত্যেক পয়সাটি পর্য্যন্ত জমিয়ে রেখেছিলেন। মার ওখানে আমাদের কিছুই খরচ ছিল না। কাপড়-চোপড় খাওয়া-দাওয়া সব খরচই তিনি দিতেন। টাকা-

কড়ি সব আমার হাতেই ছিল, খরচ সব আমিই করতুম। বাড়ীতে এসে দিনকতক ঘর-বাড়ী মেরামত করতেই কেটে গেল। তখন ধান কাটার সময়, ভাগের ধান বিক্রি কোরে আমাদের হাতে কিছু পয়সাও এল। আমাদের খানিকটা জমি অচ্যুত কাকার সঙ্গে ভাগে ছিল, সেই জমিটা ছাড়া আর কোনো জমি সেবার ভাগে দেওয়া হোলো না। স্বামী বল্লেন, অচ্যুত কাকা যদি এই বুড়ো বয়সে হাল ঠেল্‌তে পারে, আমি কেন পারব না।

মার ওখানে আমাদের দুজনেরই শরীর বেশ ভাল হয়েছিল। সেখানে সুখে খাওয়া-দাওয়া আর ঘুমোন ছাড়া আমাদের অন্য কাজ ছিল না, কিন্তু এখানে অত সুখ নেই। কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের শরীর রোগা হোয়ে গেল।

সেখানে আমাদের খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রামের সুখ কম্‌ল বটে, কিন্তু আমরা মনের সুখে দিন কাটাতে লাগলুম। বছরের শেষে আমাদের যা জম্‌ত. সেই টাকায় স্বামী আবার নতুন জমি নিতে লাগ্‌লেন। তিনি প্রায়ই বল্‌তেন, এ সময়ে যদি ভগবান আমাদের একটি ছেলে দেন তবে বড় ভাল হয়। কিন্তু ভগবান আমাদের আর সন্তান দেন-নি। বংশলোপ পেল বলে মাঝে-মাঝে তিনি দুঃখু করতেন। আমি বল্‌তুম—আর একটা বিয়ে কর না!

স্বামী হেসে বল্‌তেন—আবার!

মার কাছ থেকে চলে আসবার সময় আমার বড্ড ভয়

হয়েছিল, কত রকমের বিভীষিকাই যে মনের মধ্যে উদয় হয়েছিল তা আর বল্‌বার নয়। কিন্তু ভগবান আমাদের দিকে এবার মুখ তুলে চাইলেন। বিয়ের পর এই কটা বছর আমরা সব চেয়ে সুখে কাটিয়েছিলুম।

সেবার ধান বোনবার সময় দিন দশেক উপরি-উপরি জলে ভিজে স্বামীর ভয়ানক জ্বর হোলো। ব্যাপারটা যে এত ভীষণ তা প্রথমে টের পাই-নি; প্রথম তিন চারদিন খুব জ্বর আর কাশী, তারপরে একদিন তিনি ভুল বক্‌তে আরম্ভ করলেন। আমি তাড়াতাড়ি কবরেজকে ডেকে আনালুম। কবরেজ এসে বুক দেখে বল্লে—সান্নিপাতিক হয়েছে, খুব সাবধানে থাক্‌তে হবে, তা না হোলে বাঁচা মুস্কিল।

আনন্দকে ডেকে বল্লুম—ভাই, এ দায় থেকে আমায় রক্ষে কর।

আনন্দ বল্লে—শহরে একজন ডাক্তার আছে তাকে একবার এনে দেখালে হয় না!

পঁচিশ টাকা খরচ কোরে শহর থেকে ডাক্তার আনিয়ে দেখালুম। তিনি ওষুধ লিখে দিলেন, আনন্দ আবার শহরে গিয়ে ওষুধ নিয়ে এল। কয়েকদিন টালু-মাটাল কোরে স্বামীর জ্ঞান হোলো! সাংঘাতিক অবস্থা কেটে গেল বটে, কিন্তু জ্বর আর কিছুতেই ছাড়ে না। আনন্দকে আবার সেই ডাক্তারের কাছে পাঠালুম। ডাক্তার বল্লে—না দেখে কিছু বল্‌তে পারা যাবে না। আবার তাকে আনানো হোলো।

তবে এবারে ডাক্তার বাবু আমাদের অবস্থা বুঝে পাঁচ টাকা কমে অর্থাৎ কুড়ি টাকায় আসতে রাজী হয়েছিলেন। ডাক্তার ওষুধ লিখে দিলেন। বুকে মালিষ করতে হবে, আর খেতে হবে। মালিষের ওষুধ শহরেই পাওয়া গেল, কিন্তু খাবার ওষুধ কলকাতা থেকে আনাতে হোলো।

যমের সঙ্গে প্রায় দু-মাস ধরে টানাটানি করবার পর সেবার আমি স্বামীকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলুম। প্রায় দু-মাস পরে স্বামীর প্রথম জ্বর ছাড়ল। জ্বর ছাড়ল বটে, কিন্তু বুকে তখনো বিষম ব্যথা, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়; এত দুর্ব্বল যে, পাশ ফিরে শুইয়ে দিতে হয়। ওদিকে আমার হাতে যে টাকা ছিল তা সব খরচ হোয়ে গিয়েছে, উপরন্তু দু-জোড়া হেলে-গরুর এক জোড়া বিক্রি কোরে ফেলতে হয়েছে। এবার আর আমি যার কাছ থেকে কোনো রকমের সাহায্য চাই-নি। আমি মনে করেছিলুম ভিক্ষে কোরে যদি খেতে হয় সেও স্বীকার, তবুও স্বামীকে আর চাষের কাজ করতে দেব না। সেই ভেবেই গাই-গরুটা বিক্রি না কোরে একজোড়া হেলে-গরুই বেচে ফেল্লুম। তাঁর জ্বর ছাড়বার পর পথ্য ইত্যাদির খরচের একটি পয়সাও ছিল না, কাজেই আর এক জোড়া যে হেলে-গরু ছিল সেটাও বেচতে হোলো।

স্বামী আরও তিনমাস বিছানায় পড়ে থেকে তবে ওঠবার সামর্থ্য পেলেন। শীতের প্রথম কয়দিন বেশ কাটল, কিন্তু পৌষের শেষাশেষি তাঁর আবার একটু-একটু কোরে জ্বর হোতে

আরম্ভ করল। আমি তাঁকে কবরেজের বাড়ী যাবার জন্য কত বল্‌তুম, কিন্তু স্বামী বল্‌তেন—ও জ্বর নাইতে-খেতেই সেরে যাবে। কিন্তু জ্বর কিছুতেই ছাড়চে না দেখে আমিই একদিন সে কথা কবরেজ-মশায়কে গিয়ে বল্লুম।—তিনি অবস্থা সব শুনে বল্লেন—ভয় নেই, শীত গেলেই ও জ্বরটুকু ছেড়ে যাবে।

কবরেজ-মশায়ের কথাই বিশ্বাস করলুম। তবে স্বামী জ্বরের ওপরেই নানারকমের কুপথ্যি করতেন, আমি শুধু সেই দিকে নজর রাখলুম।

কিছুদিন এইভাবে কাটল। একদিন সকালবেলা স্বামী আর অচ্যুত কাকা বাড়ীর ভেতরের দাওয়ায় বসে কথাবার্ত্তা কইছেন, এমন সময় আমার স্বামী কাশ্‌তে-কাশ্‌তে খানিকটা রক্ত বমি কোরে একেবারে এলিয়ে পড়লেন। আমরা তখুনি তাঁর মাথায় জল দিয়ে বাতাস কোরে তাঁকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলুম। তাঁর নিশ্বাস নেবার ভয়ানক কষ্ট হোতে লাগল। বুকের মালিষের জন্য শেষবারে যে ওষুধটা এসেছিল সেটা সবখানি খরচ হয়-নি, আমি সেই ওষুধটা তাঁর বুকে মালিষ করতে লাগলুম, অনেকক্ষণ পরে তিনি যেন একটু স্বস্তি পেলেন। কিন্তু কথা বল্‌তে তখনো তার কষ্ট হচ্ছিল।

অচ্যুত কাকা সেদিন প্রায় বেলা দুপুর পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীতে আমার স্বামীর পাশে বসে রইলেন। বাড়ী যাবার

সময় আমায় ইসারা কোরে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লেন—দেখ বৌমা, নটবরের তো দেখছি যক্ষা হয়েছে। এ রোগ শিবের অসাধ্য।

অচ্যুত কাকার কথাগুলো কানে ভাল কোরে ঢোক্‌বার আগেই আমার চোখের সামনে যা-কিছু সব যেন মিলিয়ে যেতে লাগ্‌ল, কে যেন আমার গলাটা সজোরে টিপে ধরলে—আমি ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলুম, যে খুঁটিটা ধরে দাঁড়িয়েছিলুম, দু-হাতে সেটাতে চেপে ধরলুম। দুপুর বেলাকার উদাস বাতাস যেন আমার কানের কাছে সহস্রকণ্ঠে চীৎকার করতে সুরু করলে—শিবের অসাধ্য! শিবের অসাধ্য! কিন্তু আমি চাষার মেয়ে এত সহজে অধীর হোলে আমাদের চলে না, মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সাম্‌লে নিলুম। মনে হোলো—না না, হয়ত আমার শুনতে ভুল হয়েছে, আমারই মনের আশঙ্কা নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে আমায় ভয় দেখাচ্ছে। আমায় ভয় দেখাবে! হা হা! ওরে তোরা আমার চিনিস্ নে! আমি নিজের হাতে সন্তানের শব পুড়িয়ে এসেছি, এ বুকখানা যে আঙার হোয়ে আছে।

অচ্যুত কাকা আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন—তুমি উতলা হোয়ো না বৌমা! ওকে দেখবার তুমি ছাড়া আর তো কেউ নেই। একেবারে নিরাশ হবার কিছু নেই, ভগবানের দয়া থাকলে সবই সম্ভব হয়। তবে সে দয়া পাবার জন্য সাধনা করা চাই।

অচ্যুত কাকা আস্তে-আস্তে বেরিয়ে চলে গেলেন। আমার আর চলবার শক্তি ছিল না, সেই খুঁটিটা ধরেই দাঁড়িয়ে রইলুম। শীতের বাতাস নির্জ্জীব গাছগুলোর ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিয়ে উড়ে চলে যেতে লাগ্‌ল। নিস্তব্ধ দুপুরে গাছগুলোর সেই মর্ম্মান্তিক চীৎকার ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। কেবলমাত্র অনেকদূর থেকে একটা পাখী করুণ-কণ্ঠে আমার বুকের ভেতরে যে তুফান উঠেছিল তারই তালে-তালে ঘা মার্‌তে লাগল।

একটু দূরেই আমার মুমূর্ষু স্বামী শুয়ে আছেন, মধ্যে একটা মাটির দেওয়াল মাত্র ব্যবধান। স্বামী হয়তো জানেনও না, কি কাল রোগে তাঁকে আক্রমণ করেছে। আমি একলা নারী, সহায়-সম্বলহীনা, কি কোরে তাঁর চিকিৎসা চালাব, কি কোরে পথ্য জোগাব, কি কোরে তাঁকে বাঁচাব? চোখে অন্ধকার দেখতে লাগ্‌লুম। বুকের ভেতরের আসল আমিটা পাঁজ্‌রা ছিড়ে বেরিয়ে আসবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। দারুণ যন্ত্রণায় আমি সেইখানেই মূর্চ্ছিত হোয়ে পড়ে গেলুম।

বোধহয় বেশীক্ষণ অজ্ঞান হোয়ে ছিলুম না। আমার স্বামী অতি ক্ষীণকণ্ঠে ডাক দিলেন—সৌরভ এখানে আছ?

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালুম। তখনো মাথা ঘুর্‌ছিল, টল্‌তে-টল্‌তে তাঁর দরজার সাম্‌নে গিয়ে বল্লুম—আমায় ডাকচ? তিনি হাঁপাতে-হাঁপাতে বল্লেন—তোমার এখনো নাওয়া-খাওয়া কিছু হয়-নি!

—না আমি এক্ষুনি নেমে আসছি।

স্বামীর চোখের সামনে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলুম না। আমার চোখ ও মুখের অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে যদি তাঁর কোনো রকম সন্দেহ হয়, এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে এলুম।

দীহুর অসুখের সময় আমার বালা জোড়া বিক্রি হোয়ে গেয়েছিল। মার কাছে গিয়ে যখন ছিলুম তখন মা আমায় তার নিজের বালা জোড়া পরিয়ে দিয়েছিল। এ গয়না মা বেশীদিন পরতে পায়-নি। বালা তৈরি হবার কিছুদিন পরেই মা বিধবা হয়েছিল। আমি আনন্দকে ডাকিয়ে আগেই সে জোড়া বিক্রী করবার ব্যবস্থা করলুম। আনন্দ ছিল আমার সহায়, সে না থাকলে আমার যে কি হোতো তা আমি কল্পনাই করতে পারি-না। সে শহর থেকে সেই ডাক্তারটিকে ডেকে

নিয়ে এল। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে স্বামীর বুক দেখে ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন। আনন্দকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—ডাক্তার কি বল্লে ?

আনন্দ বল্লে—এক দিককার ফুশ্‌ফুশ্‌ পচে গিয়েছে, আর একটা দিক এখনো ভালো আছে, ভালো হোতেও পারেন।

ডাক্তার কলকাতার একটা দোকানের ঠিকানা দিয়ে বলে গেলেন যে, ওষুধ ফুরিয়ে গেলেই সেখান থেকে আনিয়ে নেবে। সে-সব ওষুধের দামই বা কত! যেমন দাম, তেম্‌নি সব অলক্ষুণে নাম।

চিকিৎসা আরম্ভ করতে না করতে টাকা ফুরিয়ে গেল। তখনো গাইটা ছিল, কিন্তু গাই কিন্‌তে যত টাকা লাগে বেচ্‌তে গেলে তার অর্দ্ধেকও পাওয়া যায় না। উপায় কি! গাইটা বেচে ফেল্লুম। কিন্তু, সে টাকায় শহর থেকে ডাক্তার নিয়ে আসা, বা কলকাতা থেকে ওষুধ আনা কিছুই হয় না। ডাক্তার কুড়ি টাকার কমে আস্‌তেই চায় না, একবারের দাম দিলেই টাকা ফুরিয়ে যাবে। আনন্দের সঙ্গে পরামর্শ কোরে গাঁয়ের কবরেজকে দিয়ে চিকিৎসা করানোই ঠিক হোলো।

কবিরাজ-মশায়কে গিয়ে ধরলুম—বাবা রক্ষে কর!

তিনি সব কথা শুনে চিবিয়ে-চিবিয়ে বল্লেন—ডাক্তার ডাক্‌ না। তোদের তো পয়সার কম্‌তি নেই, দু'পাঁচ দিন অন্তরেই কুড়ি পঁচিশ টাকা খরচা কোরে ডাক্তার আনাস—"

এ সব কথার আমি কি জবাব দেব? কেন যে আনাই,

কি ভয় যে আমার বুকে, সে কথা সেই বুড়ো কি কোরে বুঝবে! আমার স্বামী যে আমার কাছে কি বস্তু তা ভদ্রলোকে বুঝবে কি কোরে? আমি চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইলুম।

অনেকক্ষণ পরে কবরেজ-মশায় বল্লেন—এ সব হোলো রাজা-রাজড়ার রোগ, বিস্তর পয়সা খরচ করতে পারলে তবে যদি কিছু সুসার হয়।

নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে আশা-বিদ্যুৎ একবার অন্তরের মধ্যে ঝিলিক্ দিয়ে চলে গেল। আমি কবরেজ-মশায়ের পা-দুটো চেপে ধরে বল্লুম—বাবা ওকে বাঁচিয়ে দাও, আমার যথাসর্ব্বস্ব আমি তোমায় দেব!

আমার কথায় বোধহয় তাঁর মন ভিজ্ল। তাঁকে সঙ্গে কোরে বাড়ীতে নিয়ে এলুম। তিনি দেখে-শুনে বল্লেন—কাল সকালে আমার বাড়ীতে যাস্, ব্যবস্থা দেব।

এবারকার অসুখে আমার স্বামী বড্ড অস্থির হোয়ে পড়্তে লাগ্লেন! অন্য-অন্য বার ওষুধ খাবার জন্যে তাঁকে কত সাধ্য-সাধনা করতে হয়েছে, তাও কখনো খেয়েছেন কখনো বা খান-নি। এবারে ওষুধ খাওয়ার জন্য তিনি বড্ড ব্যস্ত হোয়ে পড়লেন। ঘরের মধ্যে গেলেই একবার ক্ষীণকণ্ঠে বল্তেন—আমায় এবার সেই ওষুধটা দেবে না।

যেদিন কবরেজ এলেন, সেদিন ঘরে একটা ওষুধও ছিল না। সকাল থেকে স্বামী তিন চারবার ওষুধের জন্য তাগাদা করলেন। আশ্চর্য্য! ওষুধ কে আনে, কোথা থেকেই বা

ওষুধের দাম জোগাই, তা কি তিনি বুঝতে পারেন না। শেষকালে আমি কয়েকটা ওষুধের শিশি লুকিয়ে ঘর থেকে বের কোরে নিয়ে গিয়ে তাতে জল দিয়ে নেড়ে একটা বাটিতে কোরে দিলুম। স্বামী আগ্রহভরে দু-হাত বাড়িয়ে বাটিটা নিয়ে এক চুমুকে জলটুকু খেয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁর সেই আগ্রহভরা মুখ দেখে আমি কেঁদে ফেল্লুম। পাছে স্বামী আমার চোখে জল দেখতে পান এই ভয়ে ঘর থেকে বাইরে পালিয়ে এসে দাওয়ার ওপর শুয়ে পড়লুম।

স্বামীকে এই আমি প্রথম প্রতারণা করলুম। মুমূর্ষু স্বামীকে ওষুধ দেবার বদলে জল দিয়েছি। বুকের মধ্যে কে যেন চাবুক মেরে-মরে বল্‌তে লাগ্‌ল—পোড়ারমুখী কল্লি কি? তুই তা হোলে স্বামীকে বিষও দিতে পারিস্! কিন্তু আমি কি করব! ওগো তোমরা কি আমায় কেউ বলে দিতে পার আমার তখন কি করা উচিত ছিল? ভাবতে-ভাবতে বুক ও মাথার মধ্যে কি রকম একটা অস্বাভাবিক জ্বালা সুরু হোলো, আমি মাটিতে মাথা কুট্‌তে লাগ্‌লুম।

অনেকক্ষণ পরে উঠে ঘরে গিয়ে দেখলুম তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। অন্যদিন এতক্ষণ কোনকালে ঘুমিয়ে পড়তেন, আজ শুধু ওষুধ খাওয়া হয়-নি সেই উদ্বেগে এতক্ষণ ঘুমুতে পারেন-নি।

সেদিন ও সেরাত্রি কোনো রকমে কেটে গেল। পরদিন সকাল বেলা উঠেই আমি কবরেজের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলুম। কবরেজ তখনো ঘুম থেকে ওঠে-নি, তার জন্য

অনেকক্ষণ বসে থাকতে হোলো। ঘুম থেকে উঠে, পুজো সেরে যখন তিনি বাইরের ঘরে এসে বসলেন তখন বেলা অনেকখানি গড়িয়ে গেছে। ঘরে ঢুকতেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম —ওষুধটা—

কবরেজ গম্ভীরভাবে বল্লে—হ্যাঁ, ওষুধ!

তারপরে একটা ফর্দ্দ বের কোরে বল্লে—এইগুলো তৈরি করতে হবে, দশটা টাকা দিয়ে যা!

ওষুধ তৈরি হয়-নি তা হোলে! হা ভগবান!

কবরেজ দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল—ওষুধ দাও মুখ দিয়ে এই কথা খসালেই তো আর ওষুধ মিল্‌বে না, এ সব দামী ওষুধ তৈরী করতে সময় যায়। অত ব্যস্ত হোলে চল্‌বে না।

মনে-মনে ভাবতে লাগ্‌লুম। আমার ব্যস্ততার কারণ তুমি কি বুঝবে? তুমি বোঝো ওষুধের কারবার! কি দায়ে পড়ে আমি যে তোমায় কাছে এসেছি—আমার মত দায়ে না পড়্‌লে তুমি তো তা বুঝতে পার্‌বে না। স্বামীকে গিয়ে কি বল্‌ব? ওষুধের জন্য তিনি যে হা পিত্যেশ কোরে আমার পথের পানে চেয়ে আছেন। কাল তাকে ওষুধ বলে জল খাইয়েছি—আজ কি দেবো!

আমি বল্লুম—কত দেরী হবে তৈরি করতে?

খুব তাড়াতাড়ি করলে ও-বেলা নাগাদ তৈরি হোতে পারে! কিন্তু টাকাটা এখুনি দিয়ে যেতে হবে, নৈলে হবে না।

আমি কাপড়ের খুঁট থেকে একখানা দশটাকার নোট খুলে

নিয়ে তাঁর কাছে রেখে দিয়ে বল্লুম—আপনার পায়ে পড়ি আমায় একটু তাড়াতাড়ি কোরে দিন—আমি বড় বিপদে পড়েছি।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি, বলে কবরেজ টাকাটা তুলে নিলে।

আমি বল্লুম—এ-বেলার মত যদি একটা বড়ী-টড়ি দেন—

ওঃ, আচ্ছা দাঁড়া—বলে তিনি আলমারী থেকে একটা শিশি বের কোরে তা থেকে একটা বড়ী আমায় দিয়ে বল্লেন—এ-বেলার মত এটা তুলসী পাতার রসের সঙ্গে মেড়ে খাইয়ে দিগে যা—। এর দাম চার আনা, ও-বেলা যখন ওষুধ নিতে আস্‌বি তখন দামটা দিয়ে যাস্‌!

বড়ীটা নিয়ে ছুট্‌তে-ছুট্‌তে বাড়ীতে ফিরে এলুম। ঘরে ঢোকা-মাত্র স্বামী বল্লেন—ওষুধ এনেছ?

তাড়াতাড়ি বড়ীটা গুলে তাঁকে খাইয়ে দিয়ে বল্লুম—এ-বেলা এইটে খাও, ও-বেলা অন্য ওষুধ দেবে, তৈরী হচ্ছে কিনা।

স্বামী আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে তাঁর জল্‌জ্বলে চোখ দুটো তুলে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আমি তাঁর দিকে চাইতেই তিনি হাত দুটো জোড় কোরে আমায় বল্লেন—সৌরভ, তুমি আমায় বাঁচাও, যেমন কোরে পার আমায় বাঁচাও! আমার মনে হচ্ছে ওষুধ-টষুধ পেলে আমি বাঁচ্‌ব। তুমি কি কোরে কি করছ, আমি জানি না। কিন্তু মরতে আমার ইচ্ছে নেই, আমায় কোনো রকমে এ-যাত্রা বাঁচিয়ে তোলো।

স্বামীর সেই করুণ মিনতি শুনে আমি আর চোখের জল

সাম্‌লাতে পারলুম না,তাঁর সামনেই কেঁদে ফেল্লুম। তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বল্লুম—তোমার কিছু ভয় নেই, কবরেজ মশায় বলেছেন তুমি নিশ্চয় সেরে উঠবে।

অনেকক্ষণ পরে তিনি বল্লেন—যদি সারি, তো তোমার পুণ্যের জোরে সারব। তবে—তবে—আমার একটা অনুরোধ এই যে, তোমার মার কাছে কোনো সাহায্য চেও-না।

আমি বল্লুম—মাকে এ-পর্য্যন্ত কোনো কথাই জানাই-নি।

—বেশ করেছ।—বলে তিনি চোখ বুঁজিয়ে ফেল্লেন।

সন্ধ্যেবেলা কবরেজের কাছে গিয়ে ওষুধ নিয়ে এলুম। কবরেজ ছুটো ওষুধ দিলে—সকাল-সন্ধ্যে ছু-বার কোরে খাওয়াতে হবে। দশ টাকায় একেবারে পনেরো দিনের ওষুধ পাওয়া গিয়েছিল। পনেরোটা দিনের মত নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমার কাছে আর মাত্র দশটাকা ছিল। সে টাকাটা আমি যকের ধনের মত আগ্‌লে রইলুম। স্বামীর পথ্য ছিল, ছুধ আর সাগু। একটু কোরে ছুধ আমায় আনন্দ দিয়ে যেত, আর আমার শ্বশুরের আমলের একটা বড় ঘড়া বেচে দেড় টাকা পেয়েছিলুম, তাই ভাঙিয়ে কিছু সাগু কিনে রাখলুম। আর আমার নিজের খাওয়া-দাওয়া—সে কোনো দিন হোতো, কোনো দিন হোতো না। জিজ্ঞাসা করবারও কেউ ছিল না। মধ্যে মধ্যে ছু'চার দিন অন্তর স্বামী একবার জিজ্ঞাসা করতেন—সৌরভ তুমি খেয়েছ?

আর মাঝে-মাঝে আনন্দ এসে উৎপাত করত। সে এসে

একেবারে হেঁসেলে গিয়ে হাঁড়ি উট্‌কে দেখ্‌ত। যেদিন তার চোখ পড়্‌তো যে, রান্না হয়-নি, সেদিন বাড়ী থেকে চাল-ডাল নিয়ে এসে আমার জন্য চড়িয়ে দিত। আমার বিশ্বাস যে, সে বাড়ীর কাউকে কিছু না জানিয়েই সে সব জিনিষ নিয়ে আস্‌ত। কিন্তু সে কথা বিচার করবার আমার ধৈর্য্য থাকৃত না, ক্ষিধের জ্বালা যে কি জিনিষ সে কথা যারা জানে, তারা আমার অবস্থা বুঝতে পারবে। সেই দারুণ দুঃসময়ের মধ্যে আনন্দের সাহায্য ও সহানুভূতি যদি না পেতুম, তবে হয়তো ক্ষুধা, আশঙ্কা ও উদ্বেগে কোন্ কালে আমার মরণ হোতো তার ঠিকানা নেই।

স্বামীকে একমাস কবরেজের ওষুধ খাওয়ালুম, কিন্তু কিছুই উপকার হোলো না। সেই একটু-একটু ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর ও প্রত্যেকবার কাশীর সঙ্গে একটু কোরে রক্ত—এর আর বিরাম নেই। তবে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলুম, স্বামী আগে যেমন সর্ব্বদা মনে করতেন যে, তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, ক্রমে সেটা কেটে যেতে লাগ্‌ল। তিনি নিজের জীবনের ওপর প্রতিদিনই আশান্বিত হোয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। আমার সঙ্গে আনন্দও এটা লক্ষ্য করেছিল। একদিন সে বল্লে—বৌ, এটা খুব আশার কথা! অনেক সময় রুগীর মনের জোরেই সে বেঁচে যায়।

আমি বল্লুম—তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক ভাই!

আমাদের যে জমিগুলো ভাগে ছিল, সেগুলো সে বছরে

আমরা নিজেই চাষ করব বলে আর ভাগে দেওয়া হয়-নি। কিন্তু, স্বামীর অসুখ হওয়ায় চাষ আর কিছুই হোলো না। জমিগুলো এম্‌নি পড়ে রইল। আমি আনন্দকে সেগুলো ভাগে বিলি কোরে দেবার কথা বল্লুম। কিন্তু যারা আগে ভাগীদার ছিল, তাদের কাছ থেকে সেবার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল বলে তারা সবাই আমাদের ওপর চটে গিয়েছিল। তার ওপরে অনেকের ঘরেই কিছু নেই, সে সময়ে জমি নিতে তারা রাজী হোলো না। আনন্দ বল্লে—জমিদারেরা আবার পেছনে লেগেছে।

আমাদের এমন দুর্দ্দশা দেখেও কি জমিদারের মনে দয়ার উদ্রেক হোলো না!

আনন্দ আশ্বাস দিয়ে গেল যে, সে খানিকটা জমি নিয়ে চাষ করবে। আনন্দ আমাদের সব জমিই নিতে পারত, কিন্তু ইদানীং অচ্যুত কাকার শরীর বড্ড ভেঙে পড়ায় তিনি আর চাষ-বাস করতে পারতেন না। যা কিছু কাজ আনন্দকেই করতে হোতো। তার কাছে এমন অর্থও ছিল না যে, জন খাটিয়ে চাষ করায়।

এদিকে প্রতিদিনই আমরা ধাপে-ধাপে দুর্দ্দশার অতল গর্ভে নেমে যেতে লাগলুম। বাড়ীতে ঘটি, বাটি, থালা যা কিছু ছিল তা একটা-একটা কোরে সব বিক্রি হোতে লাগল। কিন্তু চাষার বাড়ীতে আর কত বাসনই বা থাকে। আর তা দিয়ে সেই কাল রোগের কত দিনই বা চিকিৎসা চলে?

কবরেজকে গিয়ে বল্লুম—আর কতদিন ওষুধ খাওয়াতে হবে বাবা ? রোগের তো কিছুই আরাম হোলো না।

কবরেজ বল্লে—অত সহজে কি আর ও-রোগ সারে। একেবারে রোগের জড়্ মারতে হবে।

আমি বল্লুম—আমার তো যা ছিল সব ওষুধে খরচ করেছি। আর তো কিছু নেই।

কবরেজ বল্লেন—তা হোলে এখানে এসেছ কি করতে ?

আমার এখানে তো খয়রাতি চল্‌বে না।

মনে-মনে বল্লুম—পাষণ্ড সে কথা কি আর আমি জানিনে! আমার ছেলেটাকে খেয়েছিস্, এবার স্বামীকেও তোর হাতে তুলে দিয়েছি—আর কি, নে তাকেও খা।

প্রকাশ্যে বল্লুম—সস্তার কোনো ওষুধ নেই কি, খেতে খারাপ হোক্ গে যাক্, রোগ আরাম হোলেই হোলো।

কবিরাজ বল্লে—সস্তার ঐ বড়ী আছে—যা নিয়ে গিয়েছিলি। তাতে কিন্তু দেরী হবে।

আমি সেদিন থেকে রোজ চার আনা পয়সা দিয়ে সেই একটা বড়ী কিনে এনে সকালে আধখানা আর সন্ধ্যায় আধখানা কোরে স্বামীকে খাওয়াতে লাগলুম। ইদানীং আমার রান্না-বান্নার হাঙ্গামা ছিল না, আনন্দ রোজ দুবেলা আমার জন্য নিজের হাতে ভাত নিয়ে আসত। আমি তাকে এত কোরে বারণ করতুম কিন্তু সে কিছুতেই শুনত না। না খেয়ে-খেয়ে আমার শরীর এত খারাপ হোয়ে গিয়েছিল যে, নড়তে পারতুম না। কিন্তু দিন-

কয়েক দু-বেলা পেটে ভাত পড়্‌তেই দেহ আমার ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কি আশ্চর্য্য! মেয়েমানুষের প্রাণ কিনা! একি পাত হয়?

ক্রমে আমার হাতে যা কিছু ছিল তার শেষ পয়সাটি পর্য্যন্ত খরচ হোয়ে গেল। আনন্দর কাছে আর কিছু সাহায্য চাইতে লজ্জা করে, সে যা সাহায্য করছে তাই যথেষ্ট!

কিন্তু স্বামীকে তো আর বিনা ওষুধে ফেলে রাখ্‌তে পারিনে। আমি গাঁয়ে কাজের চেষ্টা করতে লাগ্‌লুম। কিন্তু সেখানে খাটুনীর বদলে পয়সা কেউ দিতে চায় না।

আমি স্থির করলুম যে, ভিক্ষে কোরে পয়সা তুল্‌ব। কিন্তু গাঁয়ের মধ্যে ভিক্ষে করতে পারব না। ভিন্‌-গাঁয়ে গিয়ে দুয়োরে দুয়োরে ভিক্ষে কোরে বেড়াব, সবাইকে স্বামীর কথা বুঝিয়ে বল্‌ব, একটা কোরে পয়সা কি তারা দেবে না? চাল যদি পাওয়া যায়, তাও বেচে তো চারটে পয়সাও হবে!

স্বামীকে বল্লুম, মিথ্যে কথাই বলতে হোলো। বল্লুম যে আমি ও-গাঁয়ে একটা চাকরী ঠিক কর্‌ছি, সকাল-সন্ধ্যে যেতে হবে। খরচ পত্রে কুলোতে পাচ্ছি না।...

আমার কথা শুনে তার জলজলে চোখ দুটো একবার চমকে উঠে মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমার নিষ্প্রভ হোয়ে গেল। তিনি চোখ বুঁজিয়ে পড়ে রইলেন।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম—কি বল? কাল থেকে

বেরুব। দিনকতক যাই, তুমি ভালো হোয়ে গেলে আবার চাকরী ছেড়ে দেব।

স্বামী চোখ বুঁজিয়েই বল্‌তে লাগ্‌লেন—কি কোরে আর তোমায় মানা করি, যাও। নফর দাসের পুত্রবধূ তুমি—লোকে দেখুক পেটের দায়ে তোমায় চাকরী করতে হচ্ছে।

স্বামীর দুই চোখের জল বালিশে গড়িয়ে পড়্‌তে লাগল।

পরের দিন থেকে ভিক্ষেয় বেরুতে আরম্ভ করলুম। আমাদের গ্রাম থেকে অনেক দূরে-দূরে গিয়ে ভিক্ষে করতে লাগলুম। প্রথম-প্রথম যেখানে যেতুম সেইখানেই ভিক্ষে মিলত। কেউ পয়সা দিত, কেউ বা দিত চাল। স্বামীকে বড়ী ছাড়া আরও কতকগুলো সস্তার পুষ্টিকর ওষুধ দিতে পারলুম। নানা রকম ওষুধ খেতে পেয়ে স্বামীর মুখ আবার প্রফুল্ল হোলো। এত ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছিল তবু রোগ তাঁর ভাল না হোয়ে বরং খারাপের দিকেই অগ্রসর হোতে লাগল। ক্রমেই তিনি

দুর্ব্বল হোয়ে পড়্তে লাগ্‌লেন, শেষে এমন হোলো যে, পাশ থেকে ডাবরটা তুলে কিংবা উঠে তাতে কফ ফেলবার শক্তিও হারিয়ে ফেল্লেন। কিন্তু অসুখ এত বাড়া সত্ত্বেও তিনি যে বেঁচে উঠবেন এ ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল হোয়ে গিয়েছিল। আমি চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম যে, তিনি তিল-তিল কোরে মরণের পথে এগিয়ে চলেছেন, কিন্তু তিনি রোজই বল্‌তেন,—কালকের চাইতে আজ অনেকটা ভাল বোধ হচ্ছে।

ভিক্ষে কোরে ওষুধ পত্রের খরচ চল্‌ছিল বটে, কিন্তু সেই খরচ তুল্‌তে আমার সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি কেটে যেতে লাগ্‌ল। শেষকালে স্বামীর অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, তাঁর সেবার জন্য নিয়ত কাছে একজন লোক না থাক্‌লে চলে না। লোক কে থাকবে? আমার তো কেউ নেই! মাকে খবর দিলে তিনি নিশ্চয় এসে আমাদের সেই দুঃসময়ে বুক দিয়ে পড়্‌তেন। কিন্তু, স্বামীই মাকে কোনো খবর পাঠাতে নিষেধ করেছিলেন বলে মাকে কিছু জানাই-নি।

যক্ষা ছোঁয়াকে রোগ বলে বড় কেউ আমাদের বাড়ী মাড়াত না। আনন্দ তখনো আমার সহায় ছিল বটে, কিন্তু সে তো আর নিজের সংসারের সমস্ত কাজ ফেলে রেখে আমার স্বামীর কাছে দিনরাত বসে থাক্‌তে পারে না। সকাল বেলাটা কিছুক্ষণ বসে সে চলে যেত, তারপর আমার স্বামী সমস্ত দিন একলা পড়ে থাকতেন। সেই সন্ধ্যেবেলা আমি বাড়ীতে ফিরে এসে তারপরে তাঁর ব্যবস্থা করতুম।

এই রকমে কিছু দিন কাট্‌ল, কিন্তু আর কাটে না। আমি ঠিক করলুম—যা হবার হবে, সকালবেলার মধ্যে ভিক্ষে যা পাই তাই নিয়েই চলে আস্‌ব। যার জন্য ভিক্ষা করি সেই যদি সেবা-বিনা মারা যায়, তবে কিসের জন্য ভিক্ষা। তারপর আজকাল ভিক্ষাও তেমন মিল্‌ছিল না। নিত্য ভিক্ষা দেবেই বা কে?

একদিন ভিক্ষা সেরে বাড়ী ফির্‌ছি। সকালবেলা তিন চার ঘণ্টা ঘুরে গোটাতিনেক পয়সা ও কয়েক মুঠো চাল পেয়েছি। স্বামীকে তিন দিন ওষুধ দিতে পারি-নি। ভাব্‌তে ভাব্‌তে চলেছিলুম, আজও কিছু হোলো না, তবে কি তাঁকে আর ওষুধ দিতে পারব না? স্বামী বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমি ভিক্ষা করি—তা না হোলে কৈ, আজকাল তিনি ওষুধ খাবার জন্য আর তেমন ব্যস্ত হোয়ে ওঠেন না তো? ওষুধ খাওয়া কেন, সমস্ত দিনের মধ্যে একটা কথাও তো তিনি বলেন না! কেবল তাঁর জ্বল্‌জ্বলে বড়-বড় চোখ তুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। উন্মনা হোয়ে এগিয়ে চলেছিলুম— বাতাস আমার কাণের কাছে একবার ফিশ্‌-ফিশ কোরে কি বলে চলে গেল বুঝ্‌তে পারলুম না। একি স্বামীর সেই করুণ মিনতি!—যেমন কোরে পার আমাকে বাঁচাও—

তবে কি তোমায় বাঁচাতে পারলুম না! এই কণ্টকাকীর্ণ সংসারে তুমি কি আমায় একলা ফেলে চল্লে স্বামী! দক্ষিণ দিক্‌ থেকে খানিকটা বাতাস হা-হা কোরে ছুটে এসে মাঠের,

ওপর দিয়ে হোঁচট্ খেতে-খেতে চলে গেল। আমার পথ যেন আর ফুরোয় না, এখনো প্রায় চার মাইল রাস্তা পড়ে, প্রতিদিনই এই রাস্তা পায়ে হোয়ে আসি যাই, কিন্তু সেদিন যেন আর পা চল্‌ছিল না।

মাঠ পেরিয়ে একটা গাঁয়ের ভেতর দিয়ে চলেছি। স্তব্ধ দুপুর, গাঁয়ের রাস্তায় একটি লোকও নেই। পল্লীবাসীরা খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করছে। ভাবতে-ভাবতে চলেছি—কবে একেবারে বিশ্রাম করব! স্বামীর রোগ যদি আমার ঘাড়ে তুলে দিয়ে যম তাঁকে নিষ্কৃতি দেয়! হা রে মানুষের প্রাণ! এত কষ্টেও তো বেরোয় না।

চল্‌তে-চল্‌তে দেখলুম, পথের ধারে একখানা ইঁটের বাড়ীর সাম্‌নে গাছের ছায়ায় একখানা চৌকি পাতা, আর সেই চৌকীর ওপর একটি লোক একলা বসে তামাক খাচ্ছে। বাড়ীখানা দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে, তাদের অবস্থা বেশ ভাল। আমি আস্তে-আস্তে সেইখানে সেই লোকটার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালুম। সে হুঁকো থেকে মুখ নামিয়ে বল্লে—কি রে?

—কিছু ভিক্ষে!

লোকটা আবার হুঁকো মুখে তুলে নিয়ে তামাক খেতে-খেতে আমার আপাদ-মস্তক দেখতে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ এই ভাবে দেখে বল্লে—তোর বাড়ী কোথায় রে?

একটা মিথ্যে নাম করলুম। মিথ্যে কথা আজকাল আর আমার মুখে আটকাতো না। বলে দিলুম—শ্রীপুর।

লোকটা আবার সেই রকমভাবে তামাক খেতে লাগ্‌ল।

ভিক্ষে দেবে না মনে কোরে আমি পা চালিয়ে দিতেই সে আমায় ডেকে বল্লে—চল্লি যে, শোন্ না। তোরা কি জাত?

আমি বল্লুম—কৈবর্ত্ত।

এবার সে হুঁকোটা রেখে দিয়ে বল্লে—তুই যদি সন্ধ্যে বেলা আমার কাছে আসিস্ তবে রোজ তোকে এক টাকা দেব। বুঝ্‌লি?

লোকটার ইঙ্গিত বুঝতে আমার মুহূর্ত্তমাত্র দেরী হোলো না। অন্য সময় হোলে হুঁকোটা তুলে নিয়ে তার মাথা গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে আস্‌তুম, কিন্তু সেদিন তা পারলুম না! দারিদ্র্য! দারিদ্র্য মানুষের মনকে এমনই নীচু কোরে দেয় বটে! আমার স্বামী জেল থেকে ফিরে এসে কেন যে মার ওখানে গিয়ে থাক্‌তে রাজী হয়েছিলেন সেদিন তা বুঝতে পারলুম।

মাথার ভেতরে পাক দিতে লাগ্‌ল—রোজ এক টাকা। স্বামী! স্বামী!—

আবার প্রশ্ন হোলো—কি রে বল্ না আস্‌বি? লুকিয়ে আসবি, লুকিয়ে চলে যাবি কেউ জান্‌তে পারবে না।

আর চিন্তা করবার অবসর ছিল না। আমি বলে ফেল্লুম—আস্‌ব, কিন্তু আমি বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারব না, আমায় তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।

—না না, তোকে বেশীক্ষণ ধরে রাখব না। আজ আস্‌বি তো?

আজ! আজ! আজই? বুকের ভেতর মহাপ্রাণী লাফালাফি করতে সুরু করলে। না না আজ না, আজকের দিনটা আমায় ছুটি দাও। মুখ্ ফুটে বল্লুম—আজ নয় কাল আস্‌ব।

—আচ্ছা কালই আসিস্।

এই বলে সে ট্যাঁক থেকে একটা আধুলী বের কোরে আমার হাতে দিয়ে বল্লে—ভুলিস্ নে যেন।

বুকের মধ্যে থেকে একটা হাসি যেন গর্জ্জে উঠে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল। ভুল্‌ব! এই স্মৃতি যে আমার জন্মের সাথী হোয়ে রইল। জীবনের যা দুঃখ তা তো ষোলোকলায় পূর্ণ হোলো, ইহলোকের যা কিছু সাধ সাধনা ছিল তা তো হোলোই না, কিছু চাই-ও না, এখানে আমার কাম্য কিছুই নাই। স্বামী, আজ তোমার জীবনের বিনিময়ে আমার জীবন ও সেই সঙ্গে কোটি কল্পকাল নরক সেও আমি মাথায় তুলে নিলুম।

লোকটা আমায় বলে দিলে তোকে এই আধুলিটা দিলুম। কিন্তু সে কি দিলে তা আমি ভাল কোরে দেখিও নি। হাত মুঠো কোরে সেইখান থেকে বাড়ীর পানে পাগলের মত দৌড় দিলুম। দৌড়! দৌড়! কিন্তু সে রাস্তা কি ফুরোবার! আষাঢ়ের দারুণ রোদে আকাশের শান ঘেমে উঠেছে, রাস্তায় লোক নেই, মাঠে একটা গরু পর্য্যন্ত নেই, সেই অগ্নিময় দ্বিপ্রহরের বুকের ওপর দিয়ে আমি ছুট্‌তে লাগ্‌লুম। আমার বুকের মধ্যে যে আগুন জ্বল্‌ছিল, বাইরের

আগুন তার কাছে শিশির-শীতল,—আমি প্রায় ছুটে সেই চার মাইল রাস্তা পেরিয়ে এসে নিজেদের গাঁয়ে পৌছলুম।

গাঁয়ে ঢুকে বাড়ীতে না গিয়ে আগে আমি কবরেজের ওখানে চলে গেলুম। সেখান থেকে দুটো বড়ী কিনে নিয়ে বাড়ীতে ফিরলুম।

স্বামী বিছানায় শুয়ে আছেন, তাঁর সমস্ত দেহের মধ্যে আছে শুধু চোখ দুটি। দেহ যত শীর্ণ হোয়ে চলেছিল, চোখ দুটো তত বড় আর উজ্জ্বল হচ্ছিল,—আর সে চোখের কি চাহনি! একবার চাইলে আমার মনে হোতো যে তিনি বুঝি আমার বুকের ভিতরে যা কিছু সব দেখতে পাচ্ছেন। বেশীক্ষণ আমি সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারতুম না, হয় মুখ ফিরিয়ে নিতুম নয় কোনো কাজের অছিলা কোরে ঘর থেকে অন্য কোথাও সরে যেতুম।

স্বামীকে তখুনি একটা বড়ী খাইয়ে দিলুম। ওষুধ খেয়ে তাঁর কি আনন্দ। কি আগ্রহভরে ওষুধের দিকে চেয়ে থাকা!

ওষুধ খাওয়ার পর স্বামী বল্লেন—বিকেলে যে কাজে যাচ্ছ না মনিবরা কিছু বলে না।

—না, কাল থেকে বিকেলেই যেতে হবে, সকাল বেলাটাই ছুটি নেব।

স্বামী আর কিছু না বলে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

সমস্ত দিন মাথায় আর কোনো চিন্তা নেই। শুধু সেই এক কথা—যেতে হবে, কাল যেতে হবে!

যাব কি যাব না, তখনো ঠিক করতে পারছিলুম না। লোকটা বিশ্বাস কোরে আমায় আট আনা পয়সা দিয়েছে! তাতে কি হয়েছে! স্বামীর জন্য আমি চুরি, জুচ্চুরি সব করতে রাজী আছি, আমি তো তার কাছে কিছু চাইনি! কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে অম্‌নি মনে হোতে লাগ্‌ল—যদি না যাই, স্বামীকে কি খাওয়াব, কোথা থেকে ওষুধ পথ্যের দাম পাব! মৃত্যু মৃত্যু, স্বামীর মৃত্যু নিশ্চয়! কার সঙ্গে এ-কথা নিয়ে পরামর্শ করব! আনন্দকে ডেকে জিজ্ঞাসা করব? না না, ছিঃ!—

চিন্তার যন্ত্রণায় পাগলের মত ঘরে-বাইরে ছুটোছুটি কোরে বেড়াতে লাগ্‌লুম! একবার ইচ্ছে হোতে লাগ্‌ল স্বামীকে গিয়ে সব কথা খুলে বলি! বল্‌বার জন্য একবার তাঁর ঘরেও গেলুম। কিন্তু সেই চোখ! উঃ, আমি তখনি সেখান থেকে পালিয়ে এলুম।

সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিক ঘনিয়ে এল। তখনো সেই এক চিন্তা—যেতে হবে! কাল যেতে হবে! রাত্রে স্বামীকে খাইয়ে-দাইয়ে প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লুম। তখনো স্থির করতে পারি-নি—যাব, কি যাব না। চিন্তার সীমা নাই! আমার আজন্মের সংস্কার, মানুষের সব চেয়ে বড় সংস্কার, নারীর সর্ব্বপ্রধান সংস্কার বিসর্জ্জন দিতে হবে। কিন্তু, আমি যদি না যাই, তা হোলে স্বামী তো আর ওষুধ পাবেন না। হয়তো

আমার চরিত্রের কথা দু-দিনে গাঁয়ের লোকেরা জানতে পারবে। পুকুর-ঘাটে ভদ্রলোকের বাড়ীর মেয়েরা আমায় দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে—কিন্তু সবার ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের বদলে আমি স্বামীকে ফিরিয়ে পাব! যাব যাব, নিশ্চয় যাব। স্বামী, সর্ব্বোত্তম আমার! তোমার জন্য নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন আমি বিসর্জ্জন দেব। তুমি সেরে উঠ্‌লে তোমায় সব কথা খুলে বল্‌ব, তারপর আমায় যদি পায়ে স্থান না দাও, তবে ঐ পুকুরে গিয়ে ডুবে মর্‌ব। আমি চাষার মেয়ে, স্বামীই আমার সর্ব্বস্ব! স্বামীর জন্য আমি সব করতে পারি, আমি তো ভদ্রলোকের মেয়ে নই!

আমি সেই লোকটার প্রস্তাবকে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বলে মাথায় পেতে নিলুম। তা যদি না হোতো তবে যখন একটা পয়সা কোথাও মিল্‌ছিল না, নিরাশার অন্ধকার যখন চারিদিক থেকে আমায় গ্রাস করতে উদ্যত, সেই সময় কেন এই প্রস্তাব আমার কাছে এল!

বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে-করতে কখন্‌ ঘুমিয়ে পড়লুম! ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কত স্বপ্ন দেখলুম! একবার দেখলুম আমার দীননাথ এসে আমার পাশে বসে বল্‌ছে—মা মা তোর বড় কষ্ট না! আর কটা দিন কোনো রকমে কাটিয়ে দে।

স্বপ্নের ঘোরে বাবাকে দেখলুম। এতটা বয়স হয়েছে কখনো কোনো দিন স্বপ্নে বাবাকে দেখি-নি। বাবার স্মৃতি আমার মন থেকে একেবারে মুছে গিয়েছিল, বাবা এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। তারপর একে-একে ছেলেবেলায়

বন্ধুরা এল, তাদের সঙ্গে সুদামও এল। সকলে আমাকে বল্‌তে লাগ্‌ল—ছি ছি সৈরি, শেষকালে তোর এই কাজ। তাদের সেই নিন্দায় আমার চারি পাশ ঘন অন্ধকারে ভরে গেল; আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হোতে লাগ্‌ল। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে সে নিন্দার অন্ধকার ভেদ কোরে আমার স্বামীর হাসিমাখা মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ল। আমি ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলুম! তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আশ্বাস দিতে লাগ্‌লেন। সারারাত্রি আরও কত রকমের স্বপ্ন দেখলুম তার ঠিকানা নেই। স্বপ্ন দেখতে-দেখতেই রাত্রি অবসান হোলো।

সকালবেলা আনন্দ এসে বল্লে—বৌ, নটবর-দার জন্য একবার শহর থেকে ডাক্তার আনালে হোতো না। এতদিন হোয়ে গেল কবরেজ তো কিছুই করতে পারলে না।

—কবরেজ যে কিছু করতে পারছে না, সে কথা কি আমি বুঝতে পারি-না। কিন্তু কি করবো ভাই, টাকা কোথায় পাব, ডাক্তার তো আর অম্‌নি আস্‌বে না।

আনন্দ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে—আমার যদি টাকা থাকৃত বৌ—

—তোমার টাকা না থেকেই যা করছ তা কেউ কারো জন্য করে-না। ভগবান তোমার ভাল করবেন।

আনন্দ আর কোনো কথা বল্লে না। আত্ম-প্রশংসা শুনতে না পেরে উঠে চলে গেল। আনন্দ আমার চেয়ে অনেক ছোট

ছিল, আমি তাকে ছোট ভাইয়ের মতন দেখতুম। তার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার সমস্ত মনটা নুয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। ভগবানের কাছে আকুল মিনতি কোরে বল্লুম—ওর যেন ভাল হয়, ও যেন জীবনে সুখী হয়।

বিকেল বেলাতেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লুম। স্বামীকে খাইয়ে তাঁর মাথার কাছে খানকয়েক বাতাসা ও এক গেলাস জল রেখে দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। আমার গন্তব্য স্থান আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় চার মাইল হবে। মাঠের মধ্যে দিয়ে গেলে মাইল খানেক পথ কম হয়। বিকেলে রোদ পড়ে এসেছিল, আমি মাঠের মধ্যে দিয়েই পাড়ি দিলুম। বুকের মধ্যে আশার ক্ষীণ প্রদীপ তখনো জলছিল। মনে হচ্ছিল, হয়তো লোকটা আমার সঙ্গে চালাকি করেছে। হয়তো সে যা মুখে বলেছে সেটা

তার অন্তরের কথা নয়। আমায় ডেকেছে, শুধু টাকাটা দিয়ে দেবার জন্য।

সন্ধ্যার সময় গিয়ে আমি সেই জায়গাটায় উপস্থিত হলুম। সেই চৌকীটা পড়ে রয়েছে বটে, কিন্তু সেখানে কোন লোক নেই। আমি একটু এদিক-ওদিক পায়চারি কোরে বেড়াতে লাগলুম। ভয় হচ্ছিল, অপরিচিত মেয়ে-মানুষকে গাঁয়ের ভেতর এমন কোরে ঘুরতে দেখলে সকলেই সন্দেহ করবে। কিন্তু আমার সৌভাগ্যবশতঃ কারো চোখের সামনে পড়ি-নি। পায়চারি-করতে-করতে একবার একটু দূরে চলে গিয়েছিলুম, সেবার ফিরে দেখি যে, সেই চৌকীটায় একজন কে এসে বসেছে। একটুখানি এগিয়ে এসে লক্ষ্য কোরে দেখলুম—হ্যাঁ, সেই লোকটাই বটে!

তার দিকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে চললুম। প্রত্যেক পদক্ষেপে আমার হাঁটু দুটো মুড়ে আসতে লাগল, নিজেকে কোনো রকমে জোর কোরে খাড়া রেখে এগিয়ে চললুম। আমাকে দেখেই সে বলে উঠল—ফিরে এসেছিস্, আয়।

কোনো কথা না বলে তার সঙ্গে এগিয়ে চললুম। সে বাগানের এক কোনে আমায় একটা খোড়ো ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে, সে ঘরটা বোধ হয় তাদের বৈঠকখানা।

লোকটা আমায় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। আমি তাকে আমার স্বামীর কথা বল্লুম। সে শুনে বল্লে—আমার ছোট ভাই ডাক্তারী পাশ কোরে কয়েকদিনের জন্য দেশে

এসেছে, কাল সকালে এখানে আসিস্, তাকে তোর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব!

তার কথা শুনে কৃতজ্ঞতায় আমার বুক ভরে উঠ্‌ল।

যখন সেখান থেকে বেরুলুম, তখন রাত্রির প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হোয়ে গেছে। সে আমায় একটা টাকা দেবে বলেছিল, কিন্তু আমার দুঃখু শুনে দুটো টাকা দিলে, কিন্তু সেই টাকার বদলে আমার ধর্ম্ম, আমার ইহকাল পরকাল সব সেখানে রেখে আসতে হোলো।

বাড়ী যখন ফিরলুম, তখন রাত দুপুর। অন্ধকার ঘরে স্বামী একলা পড়ে রয়েছেন। আমি নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকলুম। মনে হচ্ছিল, স্বামীর চোখ দুটো যেন সেই অন্ধকারে জ্বলছে। ভয়ে আমি আর পিদ্দীম জ্বালালুম না। অন্ধকারে এক কোণে গিয়ে বসে রইলুম। অনেকক্ষণ এই ভাবে কেটে গেল। স্বামী একবার ক্ষীণকণ্ঠে বল্লেন—সৌরভ এসেছ?

—হ্যাঁ এসেছি।

—বাতিটা জ্বালাও তো, তখন থেকে কিসে কামড়াচ্ছে।

তাড়াতাড়ি বাতিটা জেলে দেখি, মাথার কাছের বাতাসায় পিঁপ্‌ড়ে ধরেছে, আর সেই পিঁপ্‌ড়ে তাঁকে কামড়াচ্ছে। দুঃখে ক্ষোভে নিজের মাথায় একটা কিছু মেরে মরে যেতে ইচ্ছে করতে লাগ্‌ল। সেদিন সে দৃশ্য দেখে ভগবানকে ডেকে বল্লুম—আর কেন, স্বামীকে অনেক দুঃখ দিয়েছ এবার তাঁকে ডেকে নাও। আমার! আমার কপালে যা আছে তাই হবে!

পরদিন সকালে আবার সেখানে ছুট্‌লুম। সেই লোকটি তার ভাইকে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে এসে স্বামীকে দেখে ওযুধের নাম বলে গেল! তারা বল্লে—এই ওষুধ খাওয়ালেই সেরে যাবে।

আমি ওষুধের দাম জিজ্ঞাসা করায় বল্লে—টাকা দশেক হবে।

দশ টাকা! অত টাকা কোথায় পাব? আনন্দ আমার কাছেই দাঁড়িয়েছিল, সে আমার মুখের দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ কোরে চেয়ে রইল। আমি ঠিক করলুম, দশদিন সন্ধ্যের সময় বেরিয়ে দশটাকা যখন হবে তখন ওষুধ আনতে দেব।

স্বামীকে বল্লুম—ঐ লোকটা আমার মনিব, আর ওর ভাই নতুন ডাক্তার হোয়ে এসেছে।

তিনি হ্যাঁ কিংবা না, ভাল অথবা মন্দ কিছুই বল্লেন না।

পরদিন থেকে সেই লোকটার কাছে নিয়মিতভাবে যেতে আরম্ভ করলুম। তার কাছ থেকে যা পেতুম তা সন্তর্পণে এনে লুকিয়ে রাখতুম, প্রাণ গেলেও তা থেকে কিছু খরচ করতুম না! সেখানে থেকে রাত দুপুরে ফিরে এসে দেখতুম, স্বামী জেগে রয়েছেন। দিনে-রাতে তাঁর চোখে নিদ্রা নাই, আর সে কি অসহ্য যন্ত্রণা! এক-একবার মনে হোতো, এ যন্ত্রণা থেকে ভগবান ওঁকে নিষ্কৃতি দাও।

দশদিন পুরো হবার আগেই আমি সেই লোকটার কাছ থেকে দশটা টাকা আদায় কোরে নিয়ে আনন্দকে দিয়ে শিখিয়ে

কলকাতা থেকে সেই ওষুধটা আনিয়ে নিলুম, কিন্তু তখন আর ওষুধে কি হবে ? আমি বেশ বুঝতে লাগ্‌লুম, আমার স্বামী, আমার রাজা আমাকে ফেলে চল্‌ল। কিন্তু তখনো জীবনের প্রতি তাঁর কি বিশ্বাস, বাঁচ্‌বার জন্য সে কি আগ্রহ! ঠাকুর কি সে দৃশ্য দেখ্‌তে পেত না! না, আমাকে দণ্ড দেবার জন্য সে আমার স্বামীকে এই নির্য্যাতন দিয়ে আমার চোখের সাম্‌নে তাকে এমনি কোরে তিলে-তিলে মার্‌তে লাগ্‌ল।

একদিন সকাল বেলা আনন্দ এসে বল্লে—বৌ, তোমার মনিব-বাড়ী এখান থেকে কত দূরে ?

আনন্দর প্রশ্ন শুনে আমার বুকের মধ্যে ধড়াস্‌ কোরে উঠ্‌ল। আমি বল্লুম—তা, তিন চার মাইল দূরে হবে। কেন বল দিকিন্‌ ?

—তোমার বুঝি আস্‌তে আজকাল রাত্রি হয় ?

—হ্যাঁ, সকালে যাইনে কিনা।

আনন্দ সোজাসুজি বল্লে—তোমার নামে চারিদিকে নিন্দে রটেছে, লোকে বল্‌ছে যে, চাকরী-বাকরী সব মিছে কথা, ও অন্য কোথাও যায়।

আনন্দর কথার কোনো জবাব খুঁজে পেলুম না। বল্লুম—লোকে বল্লে আর কি করব বল ?

আনন্দ আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম সেইখানেই কাঠ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। আনন্দ কি আমায় সন্দেহ করেছে ?

সেদিন থেকে লোকজনের সাম্‌নে বেরুনো আমি একেবারে বন্ধ কোরে দিলুম। স্বামীর অসুখের পর নিতান্ত কাজ না পড়লে তো কারুর বাড়ীতে যেতুমই না। এখন থেকে তাও বন্ধ কোরে দিলুম। সকালবেলা পুকুরে জল আন্‌তে যেতুম, সেদিন থেকে সেখানকার ভিড় না সর্‌লে আমি যেতুম না। একদিন পাড়ার এক নাপিতদের বৌ ঘাটে আমায় স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলে—কি লো সৈরি, নতুন মানুষটিকে মনে ধরেছে তো?

মনের আগুন বুকের মধ্যে চেপে বাড়ী চলে এলুম।

স্বামী ইদানীং আর কথা কইতে পারতেন না। সরু গলায় গ্যাঙর-গ্যাঙর কোরে অস্পষ্ট ভাষায় কি যে বল্‌তেন, বুঝতে পারতুম না। আবার জিজ্ঞাসা করলে চটে যেতেন, চুপ কোরে থাক্‌তেন। একদিন কবরেজ-মশায়কে বাড়ীতে ডেকে এনে দেখালুম। তিনি দেখে-শুনে বল্লেন—ও আর বাঁচ্‌বে না।

আনন্দ আমার শেষ বন্ধু, সেও কি আমায় ত্যাগ করলে? ইদানীং সে দু-তিন দিন অন্তর একদিন কোরে আস্‌তে আরম্ভ করলে। আনন্দকে জিজ্ঞাসা করলুম—আনন্দ ভাই, শেষে কি তুমিও আমায় ত্যাগ করলে?

সে বল্লে—এখানে এলে বাবা মা বড় গোলমাল বাধায়। কেন তবুও তো আমি আসি।

আনন্দর কথায় ইচ্ছে হোলো একবার বলি—তাঁরা যদি আস্‌তে বারণ করেন তবে আর এস না। কিন্তু সাহস কোরে

সে কথা বল্‌তে পারলুম না। কিন্তু সেদিন জিজ্ঞাসা করার পর থেকে আনন্দ আবার আগেকার মত রোজ আস্‌তে লাগ্‌ল।

একদিন সকাল বেলায় স্বামী বল্লেন—দেখ আজকে আমার শরীর খুব ভাল লাগ্‌ছে। এবার বোধ হয় আমি সেরে উঠ্‌ব।

স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে মনে হোলো যেন জ্বর নেই। আশায় বুকের মধ্যে ধড়্‌ফড়্ কোরে উঠ্‌ল। ঠাকুর এ দুঃখিনীর প্রার্থনা তা হোলে তুমি শুনেছ!

স্বামী বল্লেন—আমায় দুটো জিলিপী খাওতে পার?

আমি তখুনি বাজার থেকে জিলিপী কিনে এনে তাঁকে দিলুম। কিন্তু তিনি এক কামড় নিয়ে তাও গিল্‌তে পারলেন না। আমি তাঁর মুখের ভেতরে আঙুল দিয়ে সেগুলোকে বের কোরে দিলুম।

সকালবেলাটা এক রকম তিনি বেশ প্রফুল্লভাবেই কাটালেন। সকালটা উৎরে যাবার পর আমি নাইতে যাবার কিছু আগে আমার সঙ্গে কথা কইতে-কইতে হঠাৎ বারকয়েক হেঁচকী উঠে তিনি নিস্পন্দ হোয়ে পড়লেন।

আমার সর্ব্বনাশ হোয়ে গেল।

আমার চীৎকার শুনে একমাত্র আনন্দ ছাড়া আর কেউ এল না। মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে, লোক চাই! আনন্দ একবার বাইরে গিয়ে চেষ্টা কোরে দেখলে, কিন্তু কুলটার স্বামীকে নিয়ে যেতে কেউ রাজী নয়, তারা কেউ এল না। মৃতদেহ আর শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হোলো না। আমি ও আনন্দ মৃতদেহ ধরে আমাদেরই বাড়ীর জমির একধারে নিয়ে গিয়ে দাহ করলুম!

মাকে খবর পাঠিয়েছিলুম। মা এল, কিন্তু দীনুর মৃত্যুর

পর যেমন কোরে মার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম, এবার আর তা পারলুম না। আমার এত বড় দুঃখেও মা তেমন কোরে আর আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলে না। মার কথাবার্ত্তায় বুঝতে পারলুম যে, আমার কলঙ্কের কথা সেখানে গিয়েও পৌঁচেছে।

মা আমার কাছে প্রায় তিন মাস থেকে নিজের বাড়ীতে ফিরে গেল। যাবার সময় আমায় বল্লে—এখানকার যা জমি-জারাত আছে বেচে দিয়ে চল্। আর এখানে কি করতে থাক্‌বি? কার কাছেই বা থাক্‌বি?

মা আমাকে নিয়ে যেতে চাইলে বটে, কিন্তু সেখানে আমি গেলে মাকে যে আমার জন্য একঘরে হয়ে থাকতে হবে তা আমি আগেই টের পেয়েছিলুম। মাকে বল্লুম—তুই এখন যা, আমি জমি-টমিগুলোর বন্দোবস্ত কোরে দিয়ে তার পরে যাব।

মা চলে গেল, সংসারে আমি একা! কোনো কাজ নেই, খাই-দাই বসে-বসে কাঁদি। আমার জমিগুলো আনন্দকে ভাগে দিয়ে দিলুম। এক বছরের মধ্যেই আমার ঘর ধন-ধান্যে পূর্ণ হোয়ে উঠল। সংসারে আমার সবই ছিল, তারা দারিদ্র্য দুঃখে অনাহারে কষ্ট পেয়ে মরে গেল—আজ আমার এমন কেউ নেই যার জন্য পয়সা খরচ করি।

একদিন রাত্রিবেলা একলা ঘরে শুয়ে-শুয়ে কাঁদছি। শীতের রাত্রি, কিছুতেই ঘুম হচ্ছে না। হঠাৎ আমার ঘরের জানলায় কে যেন টোকা মারলে। প্রথমে আমি গ্রাহ্যই করি-নি, কিন্তু আবার টোকা পড়তেই জানলাটা খুলে দেখি, কে একজন

দাঁড়িয়ে! সে রাত্রে জোৎস্না ছিল, কিন্তু তবুও লোকটার মুখ দেখে চিন্‌তে পারলুম না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কে?

উত্তর হোলো—আমি, দরজাটা খোলো না।

—কে তুমি?

লোকটা একটু এগিয়ে এসে আবার বল্লে—আমি, দরজাটা খোলো না।

এবার তার মুখ দেখতে পেলুম। সেই, সেই লোকটা, আমার পরম বন্ধু, আমার নিদারুণ শত্রু।

ইচ্ছে হোলো উনুন থেকে খানিকটা আংরা তুলে এনে জানলা গলিয়ে তার গায়ে ফেলে দিই। আমার দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে ঝম্-ঝম্ কোরে নাচতে আরম্ভ কোরে দিলে।

আমি বল্লুম--কি চাই তোমার এখানে? ভাল চাও তো চলে যাও!

লোকটা তখনো দাঁড়িয়ে রইল। আমি জানলাটা বন্ধ কোরে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লুম।

মাথার মধ্যে রক্তের সেই তাণ্ডব নৃত্য তখনো থামে-নি। বিছানায় পড়ে ছটফট করতে লাগলুম। স্বামী, অপরাধ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি কি জান-না প্রভু, কি দুঃখে আমি ঐ লোকটার কাছে গিয়েছিলুম! ক্ষমা, ক্ষমা কর প্রিয়তম!

দিন কাটতে লাগল। আমার এই ক্ষত-বিক্ষত বুকে বর্ষা,

শরৎ, শীত, বসন্ত কত-বার তাদের প্রলেপ লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু এ ক্ষত যে অক্ষয়! এর জ্বালা কি কথনো জুড়োবে না? এক দুই কোরে কত বছর চলে গেল, মাথার চুলে পাক ধরল, আরও কত দিন যাবে!

একদিন মার কাছ থেকে খবর এল—মার বড় ব্যারাম, মা আমায় দেখতে চায়। বাড়ীর দরজায় তালা লাগিয়ে সেই লোকের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লুম।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ীতে এসে পৌঁছলুম। বিয়ের পর সেই একবার এসেছিলুম দীননাথের মৃত্যুর পর, এতদিন পরে আবার এলুম।

মাকে দেখলুম, মার অবস্থা ভাল নয়। মার বয়সও খুব বেশী হয়েছিল। আমি তার মেয়ে, আমিই যে বুড়ী হোয়ে পড়েছি।

মা! মা! মা! জীবনের সর্ব্বপ্রথম বন্ধু আমার! পৃথিবীতে যে দিন আসি সেইদিন থেকে এখানকার আলো বাতাস যেমন কোরে সহজে আমার কাছে ধরা দিয়েছিল, তার অনেক আগে থেকে তার চেয়েও সহজে তোমার স্নেহ আজ পর্য্যন্ত আমায় ঘিরে আছে। সেই মা!—পৃথিবীর সঙ্গে আমার শেষ বন্ধন—তাও আজ ছিন্নপ্রায়!

মাকে দেখে আমি কেঁদে ফেল্লুম! আমায় দেখে মাও কেঁদে ফেল্লে।

আমি মার কাছে যাওয়ার পর মা বোধ হয় দু-মাস বেঁচে

ছিল। এই দু-মাস ধরে মা আমাকে তার সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে দিলে। শহরে এক মোক্তার ছিল, মা তাকে মাসে মাসে কিছু-কিছু কোরে দিত, সে মার হোয়ে নালিশ-পত্র করত। ধীরে-ধীরে এই সব কাজ আমায় বুঝিয়ে দিয়ে মা ছুটি নিলে। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তটুকু পর্য্যন্ত তার জ্ঞান টন্‌টনে ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে মা বল্লে—তুই তোর বাপের ভিটেতে এসেই বাস করিস্।

মার বিস্তর টাকা ছিল। চাষার ঘরে তত টাকা বোধ হয় তখন সে গাঁয়ে কারো ছিল না। আমি খুব ঘটা কোরে মার শ্রাদ্ধ করলুম। আমি মনে করেছিলুম যে, আমার নেমন্তন্ন বোধহয় কেউ নেবেই না। কিন্তু হা রে টাকা! যাদের নেমন্তন্ন করি-নি তারাও এসে জুট্‌তে লাগ্‌ল। মহা সমারোহে মার শ্রাদ্ধ হোয়ে গেল। লোকে বল্লে—চাষার ঘরে এমন সমারোহে প্রায় হোতে দেখা যায় না।

মার শ্রাদ্ধ হোয়ে যাবার পর, আর একবার শ্বশুরের গ্রামে গিয়েছিলুম। আমার স্বামীর বাড়ীঘর-জমি-জায়গা যা কিছু ছিল সব আমি আমার অসময়ের বন্ধু, আমার সকল ব্যথার ব্যথী আনন্দকে লিখে দিয়ে এলুম। গ্রামের লোকেরা অবাক হোয়ে বলাবলি করতে লাগ্‌ল—ব্যাপার কি ?

মনে-মনে বল্লুম—ব্যাপার যে কি, তা তোমরা বুঝ্‌বে কি কোরে ?

যাবার দিন আনন্দ এক হাতে তার ছেলে ও এক হাতে তার

মেয়েটিকে নিয়ে এসে আমায় প্রণাম কোরে সজলকণ্ঠে বল্লে—বৌ, আমাদের ছেড়ে চল্লে ?

রুদ্ধ কণ্ঠ কোনো রকমে পরিষ্কার কোরে নিয়ে বল্লুম—চলি ভাই, তোমার ঋণ কখনো শুধতে পারব না। যদি আমায় কখনো তোমার দরকার পড়ে, তবে ডেকো, আবার আস্‌ব।

সহস্র স্মৃতি দিয়ে ঘেরা শ্বশুরের গ্রাম ছেড়ে কাঁদ্‌তে-কাঁদ্‌তে এসে আবার আমার সেই সহস্র স্মৃতিমণ্ডিত শৈশবগৃহে প্রবেশ করলুম।

মার অর্থ আমার কুলটা নাম ঘুচিয়ে দিয়েছিল। আমার বাড়ীতে গাঁয়ের বাঁমুণ, কায়েত থেকে আরম্ভ কোরে সবারই পদার্পণ হোতো। কেউ বা আমার খাতক, কেউ বা অন্য কোনো অনুগ্রহের প্রয়াসী। ছেলেবেলার বন্ধু যারা দু-একজন তখনো বেঁচে ছিল, তারাও আস্‌ত। যারা প্রথম-প্রথম আসেনি কিছুদিন বাদে তারাও আস্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। সকলেই এল, সকলেই আস্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু সুদাম! সুদাম তো এল না।

সুদামের খোঁজ নিয়ে জানলুম যে, সে মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইয়ের বাড়ীতেই বাস করছে। মেয়ে ছেড়ে সে থাক্‌তে পারে না।

দিন আমার সুখেই কাটত লাগ্‌ল। কাল কি খাব, স্বামীকে কোথা থেকে ওষুধ খাওয়াব সে ভাবনা আর নাই। পরম সুখে খাই-দাই ঘুমোই, কিন্তু তবুও শান্তি পাই না তো!

মনে হয়, আমার সেই দিনগুলোই যে ছিল ভাল। আজ যদি আকাশ-পারের দেশ থেকে আমার দীনু ফিরে আসে, তাহলে আমি সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে রাজি আছি। এ সুখ, সুখ বটে, কিন্তু শান্তি চাই, শান্তি চাই।

একদিন সকালে সুদাম বছর দু'য়েকের একটি ছেলে কোলে নিয়ে আমার বাড়ীতে এসে হাজির হোলো। তাকে দেখে প্রথমে আমি চিন্‌তেই পারি-নি। মাথার চুল শাদা ধপ্‌ধপে, সাম্‌নের দাঁত পড়ে গিয়েছে। আমাকে দেখে সে বালকের মত কেঁদে বল্লে—সৈরি, তুই সব খেয়ে ফিরে এসেছিস্। আমিও আমার সর্ব্বস্ব রেখে এলুম।

শুনলুম, দিন কয়েক হোলো সুদামের মেয়েটা মারা গিয়েছে। মেয়ের একটি ছেলে আছে সেই ছেলে নিয়ে সে চলে এসেছে।

সুদাম কেমন কোরে তার মা-হারা মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াত, সেই ছবিটা আমার চোখের সামনে জল-জল্ কোরে ফুটে উঠ্‌ল। সুদামের দুঃখে আমার চোখেও জল এসে গেল। আমি বল্লুম—সুদাম দুঃখু করিস নি, দেখ তোর তবু একটা নাতি আছে—আমার দুনিয়ায় কেউ নেই রে!

সুদাম কোন কথা না বলে বসে-বসে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। আমার বাড়ীতে দিন কতক থেকে সুদাম নিজের বাড়ী ঝাড়-পোঁছ কোরে নিলে। তারপর একদিন আমার কোল থেকে ননীকে নিয়ে বাড়ী চলে গেল।

ছেলেটাকে নিয়ে দিনকয়েক বেশ কাট্‌ল, কিন্তু সুদাম তাকে

নিয়ে যেতেই আবার আমার বুকের মধ্যে হা হা কোরে উঠ্‌ল। একটা যদি নাতি আমার থাকৃত।

সুদাম কিছুক্ষণের জন্য রোজই তার নাতিকে আমার কাছে রেখে দিয়ে যেত। একদিন আমি সুদামকে বল্লুম—তোর নাতিটাকে আমায় দে না সুদাম, ওকে মানুষ করি।

সুদাম একটু হেসে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে বাড়ী চলে গেল।

তার পরের দিনও ঠিক সেই সময় ছেলেটাকে সে দিয়ে গেল, আবার যথাসময়ে নিয়ে গেল। আমি আর ভয়ে তাকে কোনো কথা বল্লুম না, কি জানি যদি সে ছেলেটাকে আর না নিয়ে আসে! থাক, থাক! আমার কপালে কি অত সুখ সহ্য হবে! ছেলেটা দিনে-দিনে আমার বড্ড নেওটা হোয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। আমার কাছ থেকে সুদাম যখন তাকে নিয়ে যেত তখন সে যেতে চাইত না; আমার ওপর অভিমান কোরে ফু্‌পিয়ে কাঁদ্‌তে থাকৃত।

একদিন, তখন রাত্রি বোধ হয় দশটা। শ্রাবণ মাস, কদিন থেকে আকাশ একেবারে ভেঙে পড়েছে। আমি ঘরের মধ্যে বাতিটা জ্বালিয়ে বসে আছি। বাইরে তুমুল ঝড় ও বৃষ্টি চলেছে। আমার মনটা সেদিন বড্ড খারাপ হয়েছিল। ছেলেটা সেদিন কিছুতেই আমার কাছ থেকে যেতে চাইছিল না। কেঁদে-কেঁদে হেদিয়ে পড়্‌ল, তবুও সুদাম তাকে ছাড়্‌লে না টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে গেল।

বসে-বসে নিজের দুঃখের কথা ভাবছি। ভগবান আমায় যদি ঐ রকম একটা নাতিও দিত! ভাবছিলুম অনিন্দর একটা ছেলে চাইলে সে কি আমায় দেবে না? আর তো একলা থাকতে পারি-না।

বাতিটা উস্কে দিয়ে খোলা জানলার ধারে গিয়ে কালো আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ শুনতে পেলুম, কে যেন সদর দরজায় ঘা দিচ্ছে!

ঘরের ভেতর থেকেই সাড়া দিলুম—কে?

বাইরে থেকে ডাক এল—সৈরি, সৈরি, দরজাটা খুলে দাও।

—কে? সুদামের গলা না? তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজাটা খুলে দিলুম। সুদাম তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়ল, তার কোলে ননী!

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কিরে! এত রাতে কি হোলো?

ঘরের মধ্যে এসে ছেলেটাকে কোল থেকে ধড়াস্ কোরে নামিয়ে দিয়ে সে কোঁচাটা খুলে মাথা মুছতে-মুছতে বল্লে—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! হতভাগা ছেলে সেই যে কান্না জুড়েছে এখনো পর্য্যন্ত নাগাড় চলেছে।

ননী তখন দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসছিল। আমি টপ্ কোরে তাকে বুকে তুলে নিলুম।

সুদাম বল্লে—সৈরি, ননীকে দিয়ে দিলুম তোকে!

আনন্দে আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা শিহরণ খেলে গেল। আমি আবেগে ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরলুম।

সুদাম আমার কাছে এসে ননীকে বল্লে—এবার দে হতভাগা আমার বাঁশি ফিরিয়ে দে।

ছেলেটা কেঁদে উঠে আমাকে আঁকড়ে ধরলে। আমি সুদামকে ধমক্ দিয়ে বল্লুম—যা, কেন ওকে কাঁদাচ্ছিস্ !

আমার কথা শুনে সুদাম ঘরের এক কোণে গিয়ে বস্‌ল। আমিও মেঝের ওপরে বসে ননীকে কোলে শুইয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লুম। ননীর হাতে একটা বাঁশের বাঁশি, সে সেই বাঁশিটা আমার মুখে গুঁজে দেবার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। খানিকক্ষণ পা নাড়া দিতে সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল। ননী ঘুমোতে সুদাম বল্লে—সৈরি, দেতো ওর হাত থেকে বাঁশিটা !

আমি বল্লুম—ছেলেমানুষ বায়না ধরেছিল, থাক্‌না ওটা ওর কাছে।

সুদাম ব্যস্ত হোয়ে বল্লে—না না—ভেঙে ফেল্‌বে, তুই দে ওর হাত থেকে নিয়ে।

সুদামকে জিজ্ঞেস করলুম—এখনো কি বাঁশি বাজাস্ ?

সুদাম বল্লে—বাশি বাজানো অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি !

—কতদিন রে ?

—সে অনেকদিন ! সেই যেদিন তুই শ্বশুরবাড়ীতে চলে গেলি—সেইদিন থেকে আর বাজাই-নি। সেদিন থেকে ওটাকে তুলে বেখে দিয়েছি।

কে যেন স্মৃতিসাগর থেকে এক আঁজলা জল তুলে নিয়ে আমার চোখে ঝাপটা মারলে। আমার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হোয়ে

এল। আমি আর সুদামের কথার জবাব দিতে পারলুম না। ছেলেটার হাত থেকে বাঁশিটা নেবার চেষ্টা করলুম। ঘুমিয়েও সে সেটাকে জোর কোরে ধরেছিল। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে সুদাম বল্লে—দেখ সৈরি, আমি যদি তোর আগে মরি তা হোলে আমার চিতেয় ঐ বাঁশিটা দিয়ে দিস্।

আমি নন্তীর হাত থেকে বাঁশিটা নিয়ে দেখলুম—সেই বাঁশিই বটে! কাঁপ্তে-কাঁপ্তে সেটা সুদামের হাতে তুলে দিলুম।

সুদাম সেই জল ঝড় মাথায় কোরে চলে গেল। আমি ঘরের মেঝেতে নন্তীকে কোলে নিয়ে বসে রইলুম। আকাশ তার মনের কথা ঝর্-ঝর্ কোরে ধরণীর বুকে ঝরিয়ে দিতে লাগল।

শেষ